পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৪

প্রদান উপলক্ষ্যে

স্মা র ক গ্র ন্থ

সম্পাদনা

সুকুমার বাগচি

সহযোগী সম্পাদক **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ❑ সহকারী সম্পাদক **বাসব রায়**

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

প্রাক্-কথন ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

সবিনয় নিবেদন ॥ **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৯

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ১১

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বেজবরুয়ার জাতীয়তাবোধ : ইয়ার বংগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ॥ **শিবনাথ বর্মন** ॥ ১২

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ২৩

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা ॥ **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ॥ ২৪

আসামে বিবেকানন্দ ॥ **পদ্মানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৩৬

মহাচিন ॥ **রামনাথ বিশ্বাস** ॥ ৪১

স্মৃতি-কণা ॥ **গোপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস** ॥ ৫৬

আমার জীবনের আলোকবর্তিকা ॥ **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৫৭

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **অজিৎ বরুয়া** ॥ ৬৩

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য** ॥ ৬৪

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **হীরেন ভট্টাচার্য** ॥ ৬৫

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **পবিত্র মুখোপাধ্যায়** ॥ ৬৬

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **নীলমণি ফুকন** ॥ ৬৭

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **তরুণ সান্যাল** ॥ ৬৮

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** ॥ ৬৯

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **স্বপন সেনগুপ্ত** ॥ ৭০

২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **ভবেন বরুয়া** ॥ ৭১

২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **শ্যামলকান্তি দাশ** ॥ ৭২

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৭৩

মতামত ॥ ৭৮

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে বিশেষ সংযোজন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'আসামে বিবেকানন্দ' শীর্ষক নিবন্ধ এবং রামনাথ বিশ্বাসের 'পৃথিবীর পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মহাচিন অংশ। সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, প্রতিবছরই পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনার সঙ্গে এ-যুগের পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী শিবনাথ বর্মনের অসমিয়া ভাষায় লেখা স্মারকবক্তৃতাটি বঙ্গানুবাদ না-করেই ছাপা হল। তবে অসমের বাইরের বাঙালি পাঠকদের স্বার্থে, বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এমন বেশকিছু শব্দ ও বাক্যাংশের বাংলা তরজমা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। লেখকের অসমিয়া বানান আমরা পরিবর্তন করিনি, এবং ছাপার সময় সংগত কারণেই অসমিয়া র (ৰ) ও অন্তঃস্থ-ব (ৱ) ব্যবহৃত। তবে বাংলা উদ্ধৃতিতে ওই দুটি বর্ণের বাংলা রূপই স্থান পেয়েছে।

এ-বছর পুরস্কার প্রাপক দুজন কবি সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত মোট দশজন কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এবারকার 'মতামত' বিভাগটি গত দু-বছরের তুলনায় অনেকটাই ক্ষীণকায়। স্মারকগ্রন্থটির নিরন্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা সর্বদাই আগ্রহী। সে-কারণে আমাদের বিভিন্ন ত্রুটি নির্দেশ সহ ইতিবাচক প্রস্তাব পেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল।

স্মারক বক্তৃতা দুটির ঠিক আগে পদ্মনাথ ও রামনাথের সচিত্র পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে গত দু-বছরের মতোই।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রতিবছরের স্মারকগ্রন্থই পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কুলপঞ্জিটির পুনর্মুদ্রণ তাই অব্যাহত রাখা হল।

পদ্মনাথের স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ এবং রামনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত সহ প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি— এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। সম্পাদনাকার্যে নানাভাবে সাহায্যের জন্য সহযোগী সম্পাদক শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রী বাসব রায়কে ধন্যবাদ।

প্রাক্-কথন

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পঞ্চম বৎসরের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা আমি মনে করি, এই উপস্থিতিই অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনাদের সীমাহীন ভালোবাসা প্রমাণ করে। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বার্ষিক অনুষ্ঠান মূলত বাংলা ও অসমিয়া ভাষার বিশিষ্ট কবিদের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং উভয় ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আপনারা অবশ্যই জানেন যে বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমরা দুটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি। এগুলি হল সাহিত্যের দুটি বিষয়ে আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা। প্রতিবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কারণ রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য— গুয়াহাটি শহরের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে স্মারক ভাষণমালা যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলা।

আমি বিশ্বাস করি, কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা তখনই সফল হয় যখন সেই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যিকরা জড়িত থাকেন। তাঁরা অংশ না-নিলে, আন্তরিকভাবে যুক্ত না-হলে, উৎসাহ না-দিলে কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠান কিংবা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সে-কারণে এই ধরনের অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি শহরের সাহিত্যসেবীদের যুক্ত করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমি একান্তভাবে প্রার্থনা করি যে মহানগরীর লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং বাংলা ও অসমিয়া ভাষাপ্রেমীরা আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থেকে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে শহরের সেরা সাহিত্যানুষ্ঠান হয়ে উঠতে সহায়তা করবেন।

এই সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, বার্ষিক স্মারক বক্তৃতার শ্রেষ্ঠ বিষয় কী হতে পারে তা সম্ভাব্য বক্তার নাম সহ আমাকে সরাসরি লিখে জানান। আপনাদের ইতিবাচক পরামর্শের জন্য আমরা সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকব।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা চাই বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের সূচনাতেও তাই মহাপুরুষ মাধবদেবের বরগীতের সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাদের অন্য এক স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ রচিত একটি সুপরিচিত ভক্তিগীতি। কামনা করি, সম্প্রীতির বাতাবরণে সকলের জীবন সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

আজকের সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এটি উপভোগ্য হবে।

গুয়াহাটি
১৪ মার্চ ২০১৫

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারপ্রাপকের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কবিদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের, এবং সম্ভব হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কোনো প্রধান ভাষা-সংস্কৃতির, নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী গত চার বছর পদ্মনাথ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা, শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী ও শ্রী প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রমোদবাবু লিখিত বক্তৃতা পেশ করেছিলেন, তবে অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।) এবং রামনাথ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী তরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য।

২০১৪ সালের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রী শিবনাথ বর্মন এবং শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। এবার প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে শিবনাথবাবু ও সুধাংশুশেখরবাবুর বক্তৃতা দুটি মুদ্রিত হল।

২০১৪ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতিপুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতিপুরস্কার ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি ভবেন বরুয়া এবং কবি শ্যামলকান্তি দাশের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

রমানাথ ভট্টাচার্য
সভাপতি
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি
১৪ মার্চ, ২০১৫

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়। ❑

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মাৰক বক্তৃতা

বেজবৰুৱাৰ জাতীয়তাবোধ : ইয়াৰ বংগীয় পৃষ্ঠভূমি

শিৱনাথ বৰ্মন

(১)

অসমত জাতীয়তাবোধৰ ইতিহাস সুদীৰ্ঘ নহয়। জনজাতীয়-সামন্তবাদী যুগত ন ন (নতুন নতুন) উৎপাদন কৌশলৰ অভাৱত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সামাজিক অৱস্থা যেতিয়া আছিল নিশ্চল, অর্থনৈতিক আত্ম পর্যাপ্তি হেতু ভ্রমণৰ যেতিয়া (যখন) প্রয়োজন নাছিল (ছিল না), তেনে সময়ত (সেই সময়ে) জাতীয়বাদ আছিল এক অচিনাকি (অচেনা) শব্দ। এটা (একটা) দৃষ্টান্ত। শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ, সকলোৱে জানে, অসমৰ এগৰাকী (একজন) প্রাণপুৰুষ। অথচ বিস্ময়ৰ কথা হ'লেও সত্য, জাতীয়তাবোধৰ ধাৰণা তেওঁৰ (তাঁৰ) আছিল শূন্য। প্রায় ত্রিশ হাজাৰ পদ ৰচনা কৰা তেওঁৰ লিখনিত অসম ('অচম') শব্দটোৰ মাত্র এবাৰহে (একবারই) উল্লেখ আছে। ৰাজ্য অর্থত নহয়, আহোম মুলুক অর্থতহে।

অসমত জাতীয়তাবোধৰ সূচনা হয় ব্রিটিছৰ (ব্রিটিশের) আগমনৰ পিছত (পরে)। অসমৰ প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনৰ অর্থে ব্রিটিছে অসমত কল-কাৰখানাৰ সূচনা কৰিলে, ৰাস্তা-পদূলি (রাস্তা-ঘাট) উন্নত কৰিলে। ৰাজ্যৰ সুশাসনৰ অর্থে অসমলৈ আনিলে চুবুৰীয়া (প্রতিবেশী) বংগদেশৰ লোক। এইসকলে অসমত চাকৰি-বাকৰি কৰিয়েই নাথাকিল, তেওঁলোকে সমাজত বিস্তাৰ কৰিলে সাংস্কৃতিক, বিশেষকৈ ভাষিক প্রভাৱ। ইয়াৰ পৰিণতিস্বৰূপে তেতিয়াৰ শিক্ষিত অসমীয়াসকলৰ মনত অংকুৰিত হয় জাতীয়তাবোধ। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ দিনত ইয়াৰ অংকুৰণ ঘটিছিল। কিন্তু ই পূর্ণ ৰূপত বিকশিত হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাতত।

লক্ষ্মীনাথৰ বাল্যকাল আছিল অসমীয়া তথা সমস্ত ভাৰতীয় জীৱনৰ বাবে সংক্রান্তিৰ কাল। তেওঁ যেতিয়া (তিনি যখন) চৈধ্য (চোদ্দ) বছৰীয়া কিশোৰ, তেতিয়া (তখন) সম্পাদিত হৈছিল ঐতিহাসিক ইয়াণ্ডাবু চুক্তি। সেইমতে অসমৰ শাসনভাৰ ক্রমে ক্রমে ব্রিটিছৰ হাতলৈ যায়। দেশাধিকাৰ হোৱাৰ পিছত (দেশের শাসক হওয়ার পরে) ব্রিটিছে তেওঁলোকৰ (তাঁদের) বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিৰ সহায়েৰে ৰাজ্যখনৰ প্রাকৃতিক সম্পদৰ সন্ধান কৰিবলৈ ধৰিলে (আরম্ভ করলেন)। তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিলে কয়লা, তেল ইত্যাদি, উপলব্ধি কৰিলে চাহৰ (চা-এর) প্রচুৰ সম্ভাৱনা, এই সম্পদবোৰৰ বিপণনৰ বাবে সাজি উলিয়ালে ন ন বাট-পথ (তৈরি করলেন নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট), ৰাজ্যখনলৈ আনিলে ৰে'ল আৰু ভাপ নাও (বাষ্পচালিত নৌকা)। এইদৰে (এইভাবে) স্থবিৰপ্রায় সামন্তীয় পৰিৱেশৰ পৰা ৰাজ্যখনে ক্রমে ভৰি থ'লেহি (পা রাখল) পুঁজিবাদৰ প্রথম ঢাপত (ধাপে)।

বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ সলনিৰ লগে লগে (পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে) মানুহৰ মানসিকতাৰো পৰিৱর্তন ঘটে। ইয়াৰ ব্যতিক্রম নাছিল লক্ষ্মীনাথৰ দেউতাক (পিতা) দীননাথো। অসমখন আহোমৰ দখলত থকা সময়ত দীননাথ আছিল হিন্দুৰ প্রাচীন নীতি-নিয়মৰ একান্ত অনুৱর্তী। তেওঁ নিতৌ নাম-গুণ গাইছিল (তিনি প্রত্যহ নামগান করতেন); এবেলা (একবেলা) নহয়,

দুয়োবেলা। নতুন দেশাধিকাৰসকলৰ আদৰ-কায়দা, তেওঁলোকৰ (তাঁদের) ভাষা আদিৰ প্ৰতি তেওঁ পোনতে (তিনি প্ৰথমে) বীতৰাগী আছিল। কিন্তু চিৰস্তাদাৰী (সেরেস্তাদারি) কৰাৰ পিছৰপৰা (পর থেকে) তেওঁৰ এই বীতৰাগ ক্ৰমে আঁতৰিছিল (দূর হয়ে যায়)। ইংৰাজী ভাষাৰ মোল বুজি (মূল্য বুঝে) তেওঁ নিজেই অলপ-অচৰপ (অল্পস্বল্প) ইংৰাজী শিকিছিল (শিখেছিলেন) আৰু আনকো (অন্যকেও) ইংৰাজী শিকিবলৈ উৎসাহ দিছিল। আনকি (এমন-কি) লখিমপুৰত চাকৰি কৰা কালত এখন ইংৰাজী স্কুলো স্থাপন কৰিছিল তেওঁ।

ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ নৱ অধিকৃত ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰত পতা নাছিল (স্থাপন করেননি), কিন্তু ইংৰাজী ভাষা সংস্কৃতিৰ সর্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিছিল শিৱসাগৰত, বহলকৈ ক'ব লাগিলে উজনি অসমত (বিস্তারিত ভাবে বলতে হলে উজান অসমে)। কাৰণ উজনি অসমতে চাহ-তেল-কয়লা আদি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, স্থাপন কৰা হৈছিল স্কুল-আদালত আদি। এইবোৰ চলাবৰ বাবে (চালানোর জন্য) মানুহ লগা হৈছিল (মানুষ প্রয়োজন হয়েছিল); কিন্তু এনে (এই ধরনের) প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মানুহ অসমত নাছিল। ইফালে (এদিকে) ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ সর্বভাৰতীয় ৰাজধানী কলকাতাত পতাত (কলকাতায় স্থাপন করায়) ইংৰাজী আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰে শিক্ষিত, আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ তলা-নলা পোৱা (অন্ধিসন্ধি জানা) মানুহ বংগদেশত ওলাইছিল (বেৰিয়েছিল) প্ৰচুৰ। সেয়ে অসমত চাকৰি-বাকৰিৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ অসমলৈ জাকে জাকে (ঝাঁকে ঝাঁকে) আগমন ঘটিল বাঙালী মানুহৰ। সোতৰ (সতেরো) শতিকাত জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনৰপৰাই (সময় থেকেই) অসমলৈ বাঙালী লোকৰ সোঁত বৈছিল (স্রোত বয়েছিল) যদিও ই আছিল ধীৰ। কিন্তু ঊনৈশ শতিকাত ই হৈ পৰিল বাৰিষাৰ সোঁতৰ দৰে খৰতকীয়া (বর্ষার স্রোতের মতো ক্ষিপ্র)।

এইখিনিতে মনত ৰখা ভাল, ডাঙৰ ডাঙৰ (বড় বড়) শিল্পোদ্যোগেৰে অসমক লুণ্ঠন কৰিবলৈ বাঙালীসকল অসমলৈ অহা নাছিল (অসমে আসেননি), অহা নাছিল অসমৰ বৃহৎ ব্যৱসায় আদিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপেও (হিসাবেও)। এনেবোৰ (এই ধরনের) কামত তেওঁলোক পাকৈত নাছিল (তাঁরা পারদর্শী ছিলেন না)। তেওঁলোক আহিছিল ঘাইকৈ মজলীয়া (মাঝারি) শ্রেণীৰ চাকৰিয়াল আৰু সৰু-সুৰা (ছোটখাটো) দোকানী তথা ব্যৱসায়ী হিচাপেহে। শিক্ষিত বাঙালীসকলৰ বৃত্তি আছিল ঘাইকৈ (প্রধানত) শিক্ষকতা আৰু ওকালতি। এনেবোৰ শ্রেণীৰ লোক অসমীয়াৰ মাজত (মধ্যে) বৰকৈ নাছিল (বেশি ছিল না)। সেয়ে (সে-কারণে) লক্ষ্মীনাথৰ ল'ৰালি কাললৈকে (বাল্যকাল পর্যন্ত) অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ উঠা নাছিল। সেই কালত অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ সংখ্যা আছিল কম আৰু শিক্ষিতসকলৰ বাবে চাকৰি-বাকৰিৰ বিশেষ অভাৱ নাছিল।

(২)

বাঙালীৰ আগমনে অসমত সৃষ্টি কৰা সমস্যা ৰাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নাছিল, ই আছিল ভাষিক। ব্ৰিটিছে অসম অধিকাৰ কৰাৰ পিছত (পরে) ইয়াক বেংগল প্ৰেছিডেন্সীৰ ভিতৰুৱা (অন্তর্ভুক্ত) কৰে। ১৮৩১ চনৰ (সালের) এপ্ৰিল মাহত সমস্ত প্ৰেছিডেন্সীত পাৰ্চীৰ সলনি (ফারসির পরিবর্তে) বাংলাক ৰাজ্যভাষা কৰা হয়। প্ৰেচিডেন্সীৰ এটা অংশ হিচাপে অসমতো এই প্ৰথা আৰম্ভ হয় ১৮৩৬ চনত। তেতিয়াৰপৰা (তখন থেকে) বাংলা ভাষা ডেৰকুৰি (দেড় কুড়ি অর্থাৎ তিরিশ) বছৰৰো অধিক কাল ধৰি অসমৰ স্কুল-কলেজৰ ভাষাৰূপে চলিবলৈ লয় (চলতে থাকে)। তেতিয়াৰপৰা বাংলা হৈ পৰে অসমীয়াৰ মাতৃভাষাসদৃশ। এই সময়ছোৱাত অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই তেওঁৰ আত্মজীৱনীত লিখিছে,

"তেতিয়া অসমত বঙালী (বাংলা) ভাষাৰ বৰ (বড়) আদৰ আছিল, মাতৃভাষাক সকলোৱে ঘিণাইছিল (ঘৃণা করত)। স্কুলত বঙালী, কাছাৰীত বঙালী, ডেকাবিলাকৰ (যুবক সম্প্রদায়ের) আলাপত বঙালী, তেওঁলোকৰ চিঠিতো বঙালীহে চলিছিল। সকলোৱেই ৰংগিনী বংগীয়াক সংগিনী কৰি লৈছিল। অৱশ্যে ময়ো (আমিও) এই নিয়মৰ বাহিৰ নাছিলো, বংগভাষা মোৰ বুকুৰ কুটুম আছিল।"

১৮৭২ চনত বাংলা ৰাজ্যভাষাৰূপে অসমৰপৰা উঠি যায়। কিন্তু অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অভাৱৰ বাবে এই ভাষা স্কুলবোৰত বহু বছৰলৈকে চলি থাকে। চলি আছিল বাংলাভাষী শিক্ষকৰ নিয়োগো। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেওঁৰ আত্মকথাত নিজৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ বিষয়ে লিখিছে এনেদৰে—

"বঙলা ভাষা, বঙলা গান, বঙালীৰ নিচিনাকৈ চুলি কটা,

চুৰিয়া চোলা পিন্ধা (ধুতি-শার্ট পৰা), মুঠতে (মোট কথা) বঙালী ফেশ্বন আৰু Everything Bengali, অৰ্থাৎ যি কি নহওক (যা-ই হোক-না কেন), সকলো বঙালী, আৰু এই ৰোগৰ প্ৰকোপ ইমানেই বাঢ়িছিল (এতটাই বেড়েছিল) যে ডাঙৰ ডাঙৰ সত্ৰবোৰত (বড় বড় সত্রগুলোতে) সুন্দৰ অসমীয়া ভাওনাৰ লগে লগে (নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে) ভাওনাৰ নাট ৰচোঁতা (নাটক রচয়িতা) সন্ত-মহন্তসকলে বাৰে বাংকৰা (ত্রুটিপূর্ণ) বঙলা ভাষা এটা ৰচি, ভাওনা কৰি নিজক গৌৰৱান্বিত আৰু দৰ্শকক সুখী বিবেচনা কৰিছিল।"

তেওঁ আৰু কৈছে,

"সেই কালৰ দেশাধিকাৰসকলৰ বিপৰীত বুদ্ধিৰ বলত বঙলা ভাষাক আমাৰ বিদ্যালয়বোৰত শিকোৱা হৈছিল (শেখানো হত), অসমীয়াৰ আচল মাক (আসল মা) অসমীয়া ভাষাই বকৰাণিতহে ঠাই পাইছিল (আঁস্তাকুড়ে স্থান পেয়েছিল), আৰু বিদেশিনী বাংলা ভাষাই আইৰ ঠাই (মায়ের স্থান) অধিকাৰ কৰি লৈ অসমীয়াবোৰৰ মুখত মাতৃস্তনৰ সলনি ফিডিং বটল অর্থাৎ গাখীৰ-কল দি (দুধের কল দিয়ে) 'ভাল কাক ভাল বাক' (ভালো কাক ভালো কথা) শিকাই (শিখিয়ে) সেইখিনি তেওঁৰ সৈতে গিলি খাই (তাঁর সঙ্গে গিলে খেয়ে) মিলি যাবলৈ কৈছিল।"

ওপৰৰ উক্তিটোত 'সেই কালৰ দেশাধিকাৰসকলৰ বিপৰীত বুদ্ধিৰ বলত' বাক্যাংশ মন কৰিবলগীয়া। পিছৰ কালত সৃষ্টি হোৱা বাঙালী 'আমোলাৰ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'ৰ ফান্দত বেজবৰুৱাই ভৰি দিয়া নাছিল (পা দেননি)। অসমত বাংলা ভাষা চলাৰ কাৰণ ব্রিটিছ দেশাধিকাৰসকলৰ বিপৰীত বুদ্ধি বুলি তেওঁ ঠিকেই বুজিছিল।

অসমত বাংলা ভাষাৰ যেতিয়া প্ৰৱর্তন হয় তেতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া বিদ্বৎ সমাজৰ এযাৰো মাত শুনা নগৈছিল (একটাও কথা শোনা যায়নি), আন্দোলন আদি কৰাৰ কথাতো বাদেই। কিয়নো (কেননা) সেই কালত কি ভাষিক, কি সামাজিক— সকলো দিশতে অসম আছিল এক মৰামুঁজা (মুমূর্ষু) অৱস্থাত। এফালে (একদিকে) মোৱামৰীয়া বিদ্রোহ আৰু মানৰ আক্রমণ, আনফালে কলেৰা, কলাজ্বৰ আদি মহামাৰী— এই সকলোবোৰে অসমীয়া মানুহক জ্বলা-কলা খুৱাইছিল (অতিষ্ঠ করে তুলেছিল)। গুণাভিৰাম বৰুৱাই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনীত লিখা মতে অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা তেতিয়া কমি প্রায় আধা হৈছিল। অসমীয়া ভাষাৰ অৱস্থাও আছিল তথৈবচ। অসমীয়া সাহিত্যৰ গৌৰৱময় বৈষ্ণৱ যুগটোৰ কাহানিবাই (বহু আগেই) অন্ত পৰিছিল, ইফালে (এদিকে), তাৰ ঠাই ল'ব পৰা (নেওয়ার উপযুক্ত) নতুন যুগ এটা জন্ম পোৱা নাছিল তেতিয়া পর্যন্ত। বাংলা ভাষাৰ প্রভাৱ ইমানেই বেছি (এতই বেশি) আছিল যে আমাৰ বৌদ্ধিক মহলে বাংলা ভাষাত কথাতো পাতিছিলেই (বলতেনই), আনকি নিজৰ ভাব প্রকাশৰ বাবেও আশ্রয় লৈছিল বাংলা ভাষাৰ। সমাচাৰ চন্দ্রিকা, সমাচাৰ দর্পণ আদি বাংলা কাকতত তেওঁলোকে চিঠি-পত্র আৰু প্রবন্ধ-কবিতা প্রকাশ কৰিছিল। হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে তেওঁৰ 'আসাম বুৰঞ্জি' ('আসামের ইতিহাস') লিখিছিল বাংলা ভাষাত, তেওঁৰ পুত্র আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে 'অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্র' যদিও অসমীয়াত লিখিছিল, ব্লেকষ্ট'নৰ বিখ্যাত আইনৰ পুথিখন তেওঁ কিন্তু ইংৰাজীৰপৰা ভাঙনি (অনুবাদ) কৰিছিল বাংলালৈহে। মণিৰাম দেৱানে তেওঁৰ 'বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন' ৰচনা কৰিছিল বাংলামিশ্রিত অসমীয়া ভাষাত।

ব্রনছন, ব্রাউন প্রমুখ্যে মিছনেৰীসকলৰ (মিশনারিদের), আৰু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনকে ধৰি একাংশ মুষ্টিমেয় অসমীয়া লোকৰ চেষ্টাত বাংলা ভাষাৰ হেঁচাত চেপা খাই থকা (চাপে পিষ্ট হয়ে থাকা) অসমীয়া ভাষা জননীয়ে লাহে লাহে উশাহ ল'ব পৰা হৈছিল (ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে পারছিল)। হেমচন্দ্র-গুণাভিৰামৰ চেষ্টাত ভাষা মাতৃগৰাকীয়ে বল গোটাইছিল (বল সঞ্চয় করেছিল), তথাপি অসমীয়া ৰাজ্য ভাষা হোৱাৰ পিছতো শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ বিশেষ সলনি (পরিবর্তন) হোৱা নাছিল। মিছনেৰীসকলে ঠায়ে ঠায়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল খুলিছিল সঁচা (সত্য), কিন্তু পুৰণি স্কুলবিলাকত বাংলা মাধ্যমেই চলি আছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বিদ্যাৰম্ভ কৰিছিল বাংলা মাধ্যমৰ এনে এখন (এইরকম একটি) স্কুলতে। আত্মজীৱনীত তেওঁ লিখিছে—

"প্রথমতে মোক বঙলা মাধ্যমৰ স্কুলত নাম লগাই দিয়া হ'ল— একেবাৰেই তৃতীয় শ্রেণীত (পৰৱর্তী কালৰ অষ্টম শ্রেণীত। সেই কালত শ্রেণীবিলাক ওভোতাকৈ (বিপরীতভাবে) গণা হৈছিল, এতিয়াৰ দশম শ্রেণী আছিল তেতিয়াৰ প্রথম শ্রেণী, এতিয়াৰ প্রথম শ্রেণী আছিল তেতিয়াৰ দশম শ্রেণী।) সেইকালত অসমীয়া ভাষাটো এটা

স্বতন্ত্রৰীয়া ভাষা নহয়, বৰং বঙলা আখৰেৰে এটি হেনাহুচা মাত (ত্রুটিপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গি) — এই ভ্রমৰ বশৱর্তী হৈ গভর্ণমেণ্টে অসমত অসমীয়া লোকৰ নিমিত্তে আদর্শ বিদ্যালয় নাম দি ছাত্রবৃত্তি পাছ (পাশ) কৰিবলৈ বঙলা স্কুলবোৰ পাতি দিছিল (স্থাপন কৰেছিল)। আমাৰ শিৱসাগৰতো ইংৰাজী স্কুলৰ ওচৰতে (কাছাকাছি) শাৰী পাতি এনেকুৱা মিছা দাবীৰে 'আদর্শ বংগ বিদ্যালয়' নামেৰে বৰ ঘৰ, বৰ মেজ (টেবিল), চকী-বেঞ্চ লৈ অসমীয়া কুমলীয়া ল'ৰাৰ কুমলীয়া (কোমল বালকের কোমল) মনৰ ওপৰত ঘেঁহু পিহা যাঁতৰ নিচিনা (গম-পেষা জাঁতার মতো) বঙলা ভাষাৰ যাঁত এখন (জাঁতা একটা) ঘৰঘৰ কৰে, ঘূৰাই আছিল (ঘোরানো হত)। সেই স্থানতে প্রথমতে মোৰ প্রৱেশ ঘটিল।"

(৩)

ব্রিটিছে কলিকতাত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পতাত শিক্ষা-সাহিত্য সকলোতে চহৰখন (শহরটা) ভাৰতৰ স্নায়ুকেন্দ্রত পৰিণত হৈছিল আৰু বাঙালীসকল হৈ পৰিছিল এটা গর্বিত জাতি। চাকৰি-বাকৰি কৰিবলৈ যিসকল বাঙালী অসমলৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ অধিকাংশই মনত এক উচ্চমন্যতাৰ ভাব মনত পুহি (পুষে) ৰাখিছিল। আদর্শ বংগীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া কালত লক্ষ্মীনাথে উমান পাইছিল (অনুমান করেছিলেন) এনে মনোভাবৰ। এটা সৰু (ছোট) ঘটনাৰ কথা তেওঁ তেওঁৰ আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰিছে। এবাৰ তেওঁৰ পেট কামোৰাত (কামড়ানোয়) তেওঁ ছুটী বিচাৰি স্কুলখনৰ হেডপণ্ডিত তাৰক বাবুৰ ওচৰলৈ গ'ল। তাৰক বাবুৱে তেতিয়া— লক্ষ্মীনাথৰ ভাষাত—

"আমাৰ কোমল (আতপ) চাউল ভোজনৰ বিষয়ে অনেক ৰসিকতা কৰি এটা বুজন বিধৰ (বড় ধরনের) বক্তৃতা শুনাই দিলে। কাৰণ তেওঁৰ সুযোগ উপস্থিত যে মোৰ ছুটীৰ দর্খাস্ত কৰা কাৰণটো পেট কামোৰণি আছিল। পণ্ডিত বাবুৰ বক্তৃতাৰ অন্তত মোৰ মনত খেলাইছিল যে কি লাজৰ কথা, কি 'শৰম' কৰিবৰ কথা, যে আমি অসমীয়াবোৰে কোমল চাউল খোৱাৰ নিচিনা আনে হঁহা কাম কৰোঁহঁক (আমরা অসমিয়ারা আতপ চাল খাওয়ার মতো অন্যের হাস্যোদ্রেককারী কাজ করি)। অৱশ্যে এই কাৰণটো পেট কামোৰণি নহয়। কাৰণটো হেড পণ্ডিতৰ বক্তৃতাৰ ফলত হোৱা জাতীয় দৃষ্টান্তৰ নিমিত্তে আত্মগ্লানিৰ কামোৰণি।"

আদর্শ বংগীয় বিদ্যালয়ত এবছৰমান পঢ়াৰ পিছত লক্ষ্মীনাথে শিৱসাগৰৰ ইংৰাজী স্কুলত নাম লগায়। স্কুলৰ ছেকেণ্ড (সেকেন্ড) মাষ্টৰগৰাকী আছিল, লক্ষ্মীনাথৰ ভাষাত, "দীর্ঘকাল অসম প্রবাসী বঙালী। কিন্তু আশ্চর্যৰ বিষয় যে তেওঁ এষাৰো অসমীয়া কথা ক'ব নাজানিছিল।"

উষাৰঞ্জন ভট্টাচার্যই তেওঁৰ 'ৰবীন্দ্রনাথ আৰু অসম' গ্রন্থৰ এঠাইত লিখিছে, "এচাম (একাংশ) বঙালীৰ জাত্যভিমানে অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত যে তিক্ততাৰ সৃষ্টি কৰাত দুর্ভাগ্যজনক ভূমিকা লৈছিল সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।"

এই দিশত লক্ষ্মীনাথৰ উদাহৰণ আমি দিলোৱেই। তেওঁৰো আগত বলিনাৰায়ণ বৰাই তেওঁৰ 'মৌ' আলোচনীত (পত্রিকায়) লিখিছিল—

"বঙালী মানুহে অসমীয়াক অসভ্য জাতি যেন ভাবে, বঙালীক লগ পালে (সঙ্গ পেলে) অসমীয়াৰ লগ নিবিচাৰে (সঙ্গ চায় না)। এনে অৱস্থাতো কেনেকৈ অসমীয়াৰ সৈতে বঙালীৰ সদ্ভাৱ হ'ব! অসমত বঙালীৰ মাজত কিবা জানি এজনো (মধ্যে বোধহয় একজনও) নাই যি অসমীয়া কথা ভালকৈ ক'বলৈ পাৰে।"

সেইবুলি পাহৰিলে নচলিব (তাই বলে ভুললে চলবে না) যে লক্ষ্মীনাথ কিংবা বলিনাৰায়ণ— এজনো বাঙালী বিদ্বেষী নাছিল। দুয়ো বিয়া কৰাইছিল সম্ভ্রান্ত বাঙালী পৰিয়ালত (পরিবারে)। লক্ষ্মীনাথে ঠাকুৰ পৰিয়ালত বিয়া কৰাইছিল, বলিনাৰায়ণ আছিল তেতিয়াৰ বংগদেশৰ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ৰমেশ চন্দ্র দত্তৰ জোঁৱায়েক (জামাই)। সেই কালত অনেক অসমীয়া আৰু বাঙালী পৰিয়ালৰ মাজত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হৈছিল। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ পুতেক জ্ঞানদাভিৰাম আৰু জীয়েক (কন্যা) স্বর্ণলতা দুয়োৰে বিয়া হৈছিল বাঙালী পৰিয়ালত। বাঙালীৰ আত্মাভিমানৰ বাবে সাধাৰণ অসমীয়া আৰু সাধাৰণ বাঙালীৰ মাজত মাজে মাজে খুট খাট লাগিছিল যদিও অভিজাত পৰিয়ালবোৰ ইয়াৰপৰা মুক্ত আছিল। অভিজাত অসমীয়াই সচৰাচৰ বাংলাত কথা কৈহে ভাল পাইছিল— ঠিক আজিৰ অভিজাত অসমীয়াই ইংৰাজী কৈ ভাল পোৱাৰ দৰে।

(৪)

এইখিনিতে ক'ব লাগিব, এনে অনেক বাঙালীও আছিল যিসকলে অসমক আপোন কৰি লৈছিল আৰু বাঞ্ছা কৰিছিল

অসমৰ উন্নতি। ঊনৈশ শতিকাৰ জনদিয়েক ব্যক্তিৰ নাম এই সন্দর্ভত উল্লেখ কৰিব পাৰি। জন্মেজয় দাস আছিল বংগদেশৰ মানুহ। তেওঁ অসমলৈ আহি গুৱাহাটীৰ কলেজিয়েট স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হয়হি। তেওঁ পিছত নগাঁৱলৈ বদলি হয়। তাত তেওঁৰ (সেখানে তাঁৰ) বাঙালী পত্নীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁ এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালী (মেয়ে) বিয়া কৰায় আৰু নগাঁৱতে নিগাজীকৈ (স্থায়ীভাবে) থাকিবলৈ লয়। তেওঁ অসমীয়া ভাষাত পাঠ্যপুথি লিখিছিল। কলেজিয়েট স্কুলত থকা কালত আনন্দৰাম বৰুৱা, বলিনাৰায়ণ বৰা, শিৱৰাম বৰা, জালনুৰ আলি আহমেদ আদি পৰৱৰ্তী কালৰ বিখ্যাত লোকসকল তেওঁৰ ছাত্ৰ আছিল। বুৰঞ্জীবিদ সূর্যকুমাৰ ভূঞাই তেওঁক অসমৰ 'মেথিউ আর্নল্ড' বুলি অভিহিত কৰিছে।

প্ৰায় একে সময়তে গুৱাহাটীৰ নৰ্মাল স্কুলত আছিল দুগৰাকী (দুজন) বাঙালী শিক্ষক— ব্ৰজপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী। দুয়ো অসমীয়া ভাষাত পাঠ্যপুথি লিখিছিল। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'আচাম নিউচ' কাকতত ('আসাম নিউজ' কাগজে) ব্ৰজপতিৰ পুথিৰ সমালোচনা ওলাইছিল বেৰিয়েছিল)। জয়চন্দ্ৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, শিশু সাহিত্যিক ধনাই বৰাই এইবুলি মন্তব্য কৰিছে যে "কোনো বঙালীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিলে তেওঁ তাৰ ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল।"

আৰু এগৰাকী বিশিষ্ট বাঙালীৰ নাম এই সন্দর্ভত মনলৈ আহে। তেওঁ হ'ল গোপাল চন্দ্ৰ দে। তেওঁ কোনো স্কুলৰ শিক্ষক নাছিল। সুকবি নলিনীবালা দেৱীক তেওঁ ঘৰত পঢ়াইছিল। তেওঁ ভালেমান (বেশ কয়েক) বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ কার্জন হলৰ (এতিয়াৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ভৱনৰ) পুথিভঁৰালী (গ্ৰন্থাগাৰিক) হিচাপে কাম কৰিছিল। কনকলাল বৰুৱা আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ লগ লাগি (সঙ্গে একত্রে) তেওঁ 'সাবিত্রী-সত্যবান' নাটক অসমীয়া ভাষাত ৰচনা কৰিছিল। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত যিখন ফলক আজিও আছে, সেইখন স্থাপনৰ তেওঁৰেই আছিল মূল ব্যক্তি।

বেজবৰুৱা যুগৰ আৰু এজন বাঙালী ব্যক্তিৰ নাম নকলে আলোচনাটো আধৰুৱা (অসম্পূর্ণ) হৈ ৰ'ব। তেওঁ হ'ল চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী। চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে তেওঁ গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, কোহিমা আদি তেতিয়াৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছিল। তেওঁ ইমানেই (এতটাই) দক্ষ শিক্ষক আছিল যে তেওঁৰ অধীনত পঢ়াৰ উদ্দেশ্যে পদ্মনাথ গোহাঞিঁ বৰুৱাই ছাত্ৰকালত লখিমপুৰৰ পৰা গৈ কোহিমা পাইছিলগৈ। আনন্দৰাম বৰুৱা, বলিনাৰায়ণ বৰা আদিৰপৰা আৰম্ভ কৰি লক্ষ্মীনাথ-পদ্মনাথ পর্যন্ত পৰৱৰ্তী কালৰ অনেক খ্যাতিমন্ত লোক তেওঁৰ ছাত্ৰ আছিল। অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰ অপভ্রংশ— সেই কালৰ অনেক বাঙালীৰ দৰে এনে ভ্ৰান্ত ধাৰণা তেওঁৰো আছিল। কিন্তু বাঙালী ভেমৰপৰা (শ্লাঘা থেকে) তেওঁ আছিল মুক্ত। এই বাবে (জন্য), তদুপৰি তেওঁৰ উৎকৃষ্ট শিক্ষণ প্ৰণালীৰ বাবেও, অসমীয়া-বাঙালী সকলো ছাত্ৰৰপৰা তেওঁ শ্ৰদ্ধা আৰু সমাদৰ লাভ কৰিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেওঁৰ আত্মজীৱনীত এই ব্যক্তিগৰাকীৰ একাধিকবাৰ উল্লেখ কৰিছে। এঠাইত তেওঁ লিখিছে—

"বিদ্যাৰ গৌৰৱত চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী পূর্ণিমাৰ জোন (চাঁদ) যেন আছিল। তেওঁ আমাৰ অশেষ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা আকর্ষণ কৰিছিল। কলেজৰ শিক্ষা সাং কৰি (সাঙ্গ করে) সংসাৰত সোমাই (প্রবেশ করে) বিষয়ী হৈয়ো যেতিয়াই (যখনই) অসমলৈ গৈছো, বা যেতিয়াই কলিকতাত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ (মহাশয়ের) লগত মোৰ দেখা হৈছে, তেতিয়াই (তখনই) তেওঁৰ ওচৰত (তাঁর কাছে) মোৰ ভক্তিপূর্ণ মূৰ দোঁ খাইছে (মাথা নত হয়েছে)। তেওঁৰো পুৰণি (পুরনো) ছাত্ৰ মোৰ প্ৰতি অশেষ স্নেহ থকাৰ নিদর্শন পাইছিলো। 'জোনাকী', 'বাঁহী'ত ওলোৱা ('বাঁশি'-তে প্রকাশিত) মোৰ লেখা পঢ়ি তেওঁ আমোদ পাইছিল আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে মোৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। মোৰ বিয়াৰ কিছুদিন পিছত তেওঁৰে সৈতে এবাৰ মোৰ কলিকতা চহৰত দেখা হৈছিল। তেওঁ fatherly way অর্থাৎ বাপেকে-পুতেকক উপদেশ দিয়াৰ দৰে মোক কৈছিল— 'ঠাকুৰবাড়ীত তুমি বিয়া কৰাই ভাল কৰিলা। মই বৰ সন্তোষ পাইছো। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল (পরিবার) বংগদেশত বৰ aristocratic (সম্ভ্রান্ত)। সেইবুলি তুমি তেওঁলোকৰ আগত তিলমানো দীনতা অনুভৱ কৰা প্ৰকাশ নকৰিবা। কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবা যে তেওঁলোকৰ দেশত তেওঁলোক বংশ-গৌৰৱত যেনেকৈ ডাঙৰ (বড়), তোমাৰ দেশত তুমিও তেনেকুৱা (তেমনই)।' মই অশ্রুপূর্ণ লোচনেৰে মূৰ দোঁৱাই (মাথা নিচু করে) তেওঁৰ কথাৰ মর্ম অনুভৱ কৰি appreciation জনালো।"

(৫)

১৮৮৩ চনত (সালে) লক্ষ্মীনাথে কুৰিটকীয়া (কুড়ি টাকার) এটা বৃত্তি পাই শিৱসাগৰৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্রেন্স পৰীক্ষা পাছ কৰে। তেওঁ উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতালৈ যাবলৈ মন মেলিলে। সেই কালত কলকাতাত পঢ়াটো আছিল অসমৰ প্রতিজন মেধাবী ছাত্রৰ সপোন (স্বপ্ন)। অৱশ্যে এই সপোনৰ পৰম্পৰা দীঘলীয়া নাছিল। ব্রিটিছে দেশ অধিকাৰ কৰাৰ আগলৈকে কলকাতা চহৰৰ (শহরের) অস্তিত্বই নাছিল, ই আছিল তিনিখন গাঁওৰ সমষ্টি মাত্র। ব্রিটিছে কলকাতা চহৰ স্থাপন কৰি ইয়াত ৰাজধানী পাতিলে; ১৮৫৮ চনত ইয়াত প্রেচিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হ'ল, প্রায় লগে লগে (সঙ্গে সঙ্গে) চহৰখনত আৰু অনেক কলেজ গঢ়ি উঠিল। ভাৰতৰ সকলো প্রান্তৰপৰা ছাত্র ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। সেইসকলৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথো আছিল এজন।

লক্ষ্মীনাথে কলকাতালৈ আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে হয়, কিন্তু ইয়াত বিধি পথালি দিলে তেওঁৰ দেউতাকে (বাধা দিলেন তাঁর পিতা)। দীননাথৰ দুই পুত্র গোবিন্দ আৰু গোলাপ (লক্ষ্মীনাথৰ ককায়েক (বড় ভাই) ইতিমধ্যে কলকাতাত পঢ়ি 'চাহেব' ('সাহেব') হৈছিল, দেউতাকৰ সামন্তীয় প্রায় আদর্শ এজনেও লোৱা নাছিল (একজনও গ্রহণ করেননি)। গোবিন্দ বিলাতী শিক্ষাৰ পক্ষপাতী হৈ উজনি (উজান) অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল খুলিলে, গোলাপে ডাক্তৰ হৈ খ্রীষ্টান ধর্ম ল'লে আৰু জীৱনৰ সৰহভাগ (বেশিরভাগ) কাল ভাৰতৰ বাহিৰত কটালে।

লক্ষ্মীনাথেও কলকাতালৈ গৈ বিজতৰীয়া (বিজাতীয়) হ'ব বুলি দেউতাকে শংকা কৰিছিল। লক্ষ্মীনাথৰ ভাগ্য ভাল, গোবিন্দ্র চন্দ্রকে ধৰি তেওঁৰ আন এজন ককায়েকে টানি কৰা অনুৰোধত (গোবিন্দচন্দ্র সহ তাঁর আরেকজন দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে) লক্ষ্মীনাথক কলকাতালৈ পঠাবলৈ দেউতাক (পিতা) অৱশেষত সৈমান (গররাজি) হ'ল। দেউতাকৰ পূর্ব বন্দৱস্ত অনুসৰি লক্ষ্মীনাথ কলকাতীয়া মেচত নাথাকি থাকিবলৈ ল'লে কালীঘাটৰ হালদাৰ উপাধিধাৰী এটা ব্রাহ্মণ পৰিয়ালৰ লগত (পরিবারের সঙ্গে)। এয়াই আছিল বাঙালী মানুহৰ আদব-কায়দাৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ প্রথম পৰিচয়। ব্রাহ্মণ পৰিয়ালৰ সৈতে (সঙ্গে) তেওঁক থোৱা হৈছিল কিয় (তাঁকে রাখা হয় কেন)? ইয়াৰ কাৰণ, লক্ষ্মীনাথে তেওঁৰ আত্মজীৱনীত লিখিছে— "যাতে মই অসমীয়া ছাতৰৰ মেচত থাকি (ছাত্রদের মেস-এ থেকে) জাত ৰূপে মোত অৱতাৰ হোৱা শিশুটিক মই বধ কৰিব নোৱাৰোঁ (আমার জাত না-যায়)।" ইমানেই আছিল সেই কালত জাত-পাতৰ প্রভাৱ।

হালদাৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকি লক্ষ্মীনাথে ৰিপন কলেজত নাম লগালে। তেওঁ থকা ঠাইৰপৰা কলেজখন আছিল অনেক দূৰ, এনেয়েও হালদাৰৰ ঘৰৰ খোৱা-বোৱা তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল (এমনিতেও হালদারের বাড়ির খাওয়াদাওয়া তাঁর ভালো লাগেনি)। সবাতোকৈ ডাঙৰ (সবচেয়ে বড়) কথা, তেওঁক কলকাতালৈ অহা-নহাক লৈ (আসা না-আসা নিয়ে) দেউতাকে ভালেদিনলৈ (অনেকদিন পর্যন্ত) মন স্থিৰ কৰিব নোৱাৰাত (না-পারায়) তেওঁৰ নাম লগোৱাত পলম হৈছিল (ভর্তি হতে দেরি হয়); কলেজৰ পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যে বহু দূৰ আগ বাঢ়ি গৈছিল (এগিয়ে গিয়েছিল)। লক্ষ্মীনাথে ইয়াৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল (এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারেননি)। সাত-পাঁচ গুণি (ভেবে) কলকাতাত দুমাহমান (দু-মাসের মতো) থাকিয়েই তেওঁ ঘৰলৈ গুচি আহিল (বাড়িতে ফিরে আসেন)।

শিৱসাগৰৰ ঘৰত কিছুদিন লটং-পটংকৈ (ভ্যাগাবন্ডের মতো) থকাৰ পিছত লক্ষ্মীনাথ পুনৰ কলকাতালৈ আহে। এইবাৰ তেওঁ নাম লগালে চিটী (সিটি) কলেজত। দেউতাকৰ জাত-পাতৰ কথালৈ নাভাবি তেওঁ এইবাৰ থাকিবলৈ ল'লে কলেজৰ ওচৰৰে এটা মেচত (কাছাকাছি একটা মেস-এ)। চিটী কলেজত দুবছৰ পঢ়ি তেওঁ তাৰপৰা এফ এ (পৰৱর্তী কালৰ আই এ, এতিয়াৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলা) পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়। তেওঁ এইবাৰ জেনেৰেল এছেম্বলী ইনষ্টিটিউশ্যন (পৰৱর্তী কালৰ স্কটিছ চার্চ কলেজ)ত বি এ পঢ়িবলৈ লয় আৰু যথা সময়ত তাৰপৰা স্নাতক উপাধি লয়। ইয়াৰ পিছত তেওঁ উকীল হ'বলৈ মন মেলি (হওয়ার বাসনায়) আইন কলেজত, লগতে ইংৰাজী বিষয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শ্রেণীতো নাম লগায়। কিন্তু আইনৰ পৰীক্ষাত অনুত্তীর্ণ হোৱাত তেওঁ পঢ়া এৰে (ত্যাগ করেন) আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ মনস্থ কৰে।

(৬)

কলেজত পঢ়া কালত বিভিন্ন বাঙালী লোকৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ চিনা-পৰিচয় (চেনাজানা) হৈছিল নিশ্চয়, যদিও কাৰো লগতে তেওঁ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ দৃষ্টান্ত পাবলৈ নাই।

‘অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা’ৰ কাম-কাজত, লগতে বন্ধুবৰ চন্দ্রকুমাৰ আগৰৱালাৰ ‘জোনাকী’ৰ কাম-কাজত তেওঁ ব্যস্ত আছিল। বাঙালী মানুহৰ লগত তেওঁ মিলামিচাতো নকৰিছিলেই (মেলামেশা তো কৰেনইনি), বৰং সাধাৰণ বাঙালীৰ সংগৰপৰা তেওঁ নিজক আঁতৰাইহে (সরিয়ে) ৰাখিছিল। ইয়াৰ কাৰণ তেওঁৰ বাঙালী বিদ্বেষ নাছিল, আছিল তেওঁৰ চাহাবিয়ানা (সাহেবিয়ানা)। সেই কালত তেওঁ আচাৰ-ব্যৱহাৰ সকলোতে আছিল চাহাবী ঢঙৰ মানুহ। ‘আপুনি কি কৰে, দৰমহা কিমান (বেতন কত) পায়’— সাধাৰণ বাঙালীয়ে প্রথম চিনাকিতে (পরিচয়ে) কৰা এনে ধৰণৰ ‘গাঁৱলীয়া’ (গ্রাম্য) প্রশ্নত তেওঁ বিৰক্ত হৈছিল। আত্মজীৱনীৰ এঠাইত তেওঁ লিখিছে যে ‘এজন বাঙালী ভদ্রলোকৰ মুখত এনে প্রশ্ন শুনি’ তেওঁক ‘কিলাবলৈ কেইবাবাৰো উঠাও মনত আছে (তাকে কয়েকবার কিলানোর ইচ্ছা হওয়ার কথাও মনে আছে)।’ ইয়াৰ এটা হাঁহি উঠা (হাসি-ওঠা) পৰিণতিও তেওঁ আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰিছে। এবাৰ তেওঁৰ প্রিয় বন্ধু হেমচন্দ্র গোস্বামীৰ সৈতে তেওঁ কৰ’বালৈ যাবলৈ বুলি (কোথাও যাওয়ার জন্য) ৰে’লগাড়ীত উঠিল।

“মোৰতো উৎকৃষ্ট চাহাবী মূর্তি”, তেওঁ লিখিছে, “সিজনো তথৈৰচ। সেই দেখি মই ৰে’লগাড়ীৰ ভিতৰত থকা বাঙালী সহযাত্রী দুজনেৰে সৈতে এযাৰো নকলোৱেই (সঙ্গে একটা কথাও বলিনি)। গোস্বামীও প্রিয় বন্ধুৰ নেতৃত্বত নিস্তব্ধ।”

ওৰে ৰাতি (সারারাত) ৰে’লগাড়ীত গৈ গৈ পুৱা (সকালে) এটা ষ্টেচনত (একটা স্টেশনে) তেওঁলোক ৰ’লগৈ (তাঁরা নামলেন)। তেওঁলোকে বাহিৰলৈ চাই (চেয়ে) দেখে, তেওঁলোকে যিটো ষ্টেচনত নামিব খুজিছিল (যে-স্টেশনে নামতে চেয়েছিলেন) বহু আগতেই সেইটো পাৰ হৈ আহিছে! ৰে’লত নিবোকা চামোন হৈ বহি নাথাকি (চুপচাপ বসে না-থেকে) বাঙালী ভদ্রলোক দুজনৰ লগত কথা পতা হ’লে এনে নহ’লহেঁতেন (সঙ্গে কথাবার্তা বললে এ-রকম হত না)। লক্ষ্মীনাথে লিখিছে, “মোৰ উগ্র চাহাবীয়ে (চাহাবিয়ানোই) এই প্রথম ঢকা খালে (ধাক্কা খেল)। মোৰ শিক্ষা হ’ল কি নহ’ল নুবুজিলো। কিন্তু হোৱাটো উচিত আছিল।”

ডেকা (যুবক) কালৰ চাহাব (সাহেব) লক্ষ্মীনাথে সাধাৰণ বাঙালীৰ লগত বিশেষ কাৰণ নহ’লে কথা নাপাতিছিল (বলতেন না)। কিন্তু ইংৰাজীৰ লগতে বাংলা সাহিত্য তেওঁ পঢ়িছিল প্রচুৰ। আৰম্ভণি অৱস্থাতে বাংলা ভাষাতে কবিতা ৰচি তেওঁ বাংলা সাহিত্যত নাম ৰখি যাব খুজিছিল (রেখে যেতে চেয়েছিলেন)। এবাৰ ‘ৰংগলাল চট্টোপাধ্যায়’ নাম লৈ (নিয়ে) তেওঁ বাংলা ভাষাত দুটা প্রেমৰ পদ্য লিখি সেই দুটা দুখন বাংলা কাকতলৈ পঠিয়াই দিলে। কিন্তু কবিতা দুটা প্রকাশ নহয়হে নহয়। অৱশেষত তেওঁৰ ধৈর্যৰ বান্ধ ভাগি গ’ল (বাঁধ ভেঙে গেল), কবিতা দুটা হয় প্রকাশ কৰিবলৈ, নহয় সেই দুটা ঘুৰাই পঠিয়াবলৈ তেওঁ সম্পাদক দুজনলৈ চিঠি লিখিলে। এজনৰপৰা উত্তৰ আহিল, ‘আপনার কবিতাটি প্রকাশের অযোগ্য। ফেরৎ পাঠালাম।’ আনজন আছিল বেছ (বেশ) ৰসিক। তেওঁ উত্তৰ দিলে, ‘আপনার কবিতাটি আমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যত্নপূর্বক রেখে দিয়েছি। সেখান থেকে তুলে নিয়ে আপনার কাছে পাঠানো কষ্ট হ’ল, পারলাম না। ক্ষমা করবেন।’

বাংলা ভাষাত সাহিত্য চর্চাৰ এয়ে আছিল লক্ষ্মীনাথৰ প্রথম আৰু শেষ প্রচেষ্টা। সেই বুলি (তাই বলে) বাংলা ভাষাত তেওঁ নিলিখাকৈ থকা নাছিল (না-লিখে থাকেননি), কিন্তু লিখিছিল ঘৰুৱা চিঠি-পত্রতহে। পত্নী-কন্যা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ তেওঁ সচৰাচৰ বাংলা ভাষাতে চিঠি-পত্রাদি লিখিছিল, লিখিছিল পদ্যাদিও।

(৭)

চাহাব (সাহেব) লক্ষ্মীনাথে ‘জোনাকী’ কাকতত (পত্রিকায়) অসমীয়া সাহিত্য চর্চা কৰি থকাৰ সময়তে বংগদেশৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ বিয়া ঠিক হয়। পত্নী আছিল, সকলোৱে জানে, ৰবীন্দ্রনাথৰ ককায়েক (দাদা) হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী। এই বিয়াত বহাৰ ক্ষেত্রত (বসার ক্ষেত্রে) লক্ষ্মীনাথে তেওঁৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ লগত বিশেষ আলোচনা কৰিছিল বুলি মনে নধৰে (বলে মনে হয় না)। ককায়েক গোবিন্দই তেওঁৰ বাবে বেলেগ ছোৱালী (তাঁর জন্য অন্য মেয়ে) ঠিক কৰিছিল। ইফালে (এদিকে), লক্ষ্মীনাথৰ বিয়াৰ আগে আগে তেওঁৰ পিতৃ দীননাথে গংগা স্নান কৰিবলৈ কলকাতালৈ আহোঁতে (আসায়) তেওঁৰ লগত অহা সৰু পুতেক (তাঁর সঙ্গে আগত ছোট ছেলে) লক্ষ্মণৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয়। দীননাথ বিয়াত উপস্থিত নাছিল— হয়তো পুত্রৰ শোকত, হয়তো এই কাৰণতো যে লক্ষ্মীনাথে অসমীয়া ছোৱালী বিয়া নকৰালে, বিয়াত হোমো নুপুৰিলে

(যজ্ঞও করলেন না)। বিয়া হৈছিল ব্রাহ্ম ৰীতি মতে যিটো আছিল তেওঁৰ শহুৰেকৰ (শ্বশুৰের) পৰিয়ালৰ ধর্ম। লক্ষ্মীনাথে নিজৰ বিয়াৰ বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা কৰি যোৱা নাই। কিন্তু লক্ষ্মীনাথৰ বিয়াখনত তেওঁৰ দেউতাক (তাঁৰ পিতা) খুব সন্তুষ্ট আছিল যেন নালাগে (ছিলেন বলে মনে হয় না)।

ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত বিবাহ আছিল লক্ষ্মীনাথৰ জীৱনৰ, ক'বলৈ গ'লে (বলতে গেলে), এটা দিশ পৰিৱর্তনৰ কাল। বিয়াৰ আগতে তেওঁ অ. ভা. উ. সা.ৰ লগত (অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সঙ্গে) ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত আছিল, 'জোনাকী'ত তেওঁ প্রবন্ধ-পাতিও লিখিছিল। কিন্তু তেতিয়ালৈকে (তখন পর্যন্ত) তেওঁৰ জাতীয়তাবোধ তীব্র আছিল যেন নালাগে (ছিল বলে মনে হয় না)। ইয়াক তীব্র কৰি তুলিলে, খুব সম্ভৱ, ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত তেওঁৰ বৈবাহিক সম্বন্ধই। কথাখিনি লক্ষ্মীনাথে তেওঁৰ আত্মজীৱনীত নিজে বহলাই কৈছে (বিস্তারিত ভাবে বলেছেন)—

"শহুৰৰ ঘৰৰ (এই) সাহিত্যিক মহিলা আৰু পুৰুষসকলে অসমীয়া ভাষা আৰু বঙলা ভাষাৰ পার্থক্য আৰু বঙলা ভাষাৰ শ্রেষ্ঠত্বৰ বিষয় লৈ লাহে লাহে (ধীরে ধীরে) মোৰ সৈতে তর্কত প্রবৃত্ত হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকেই আগ বাঢ়ি আহি (তাঁৰাই এগিয়ে এসে) মোক তর্ক-যুদ্ধত সুমাই ল'লে (ঢুকিয়ে নিলেন)। অগত্যা মই সোমাবলগীয়াত পৰিলো (আমাকেও প্রবেশ করতে হল)। যদিও এনে unpleasent অর্থাৎ অপ্রীতিকৰ কার্যত সোমাবৰ মোৰ মন সমূলি নাছিল (প্রবেশে আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না)। তেওঁলোকে ভাবিছিল, পূর্ব বংগৰ ভাষা যেনেকৈ (যেমন) নদীয়া-শান্তিপুৰৰ কলিকতীয়া ভাষাৰ এটা বেৰেৰিবাং (আবোলতাবোল) অৱস্থা বা দুৰৱস্থা, অসমীয়া ভাষাও তেনে (সেইরকম)। তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, মই অসমীয়া ভাষাৰ হকে (পক্ষে) চেষ্টা চৰিত্র ত্যাগ কৰি বংগ ভাষাৰ উন্নতি কামনাত লাগি যাওঁ। তাৰ গুৰিত (মূলে) এনে এটা ভাব আছিল যে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰভুক্ত জোঁৱাই (জামাই) মই (আমি) যেন সম্পূর্ণ বঙালী হৈ যাওঁ। কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে যে ইংৰাজীত কবৰ নিচিনা 'They have caught a Tartar in me,' মই অজীণ পাতকী ('অজীণ পাতকী'-র অর্থ, যে কারো সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না) হৈ দেখা দিলো। তেওঁলোকৰ সুখৰ সপোনত ব্যাঘাত ঘটিল। মই তেওঁলোকক নিৰাশ কৰিলো। মোৰ সাজ-পাৰে (সাজপোশাক) তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত প্রচলিত সাজ-পাৰৰ নিচিনা (মতো) কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাতো মই তেওঁলোকক নিৰাশ কৰিলো। অসমীয়া ভাষাৰ হকে মোৰ হাতত ডাঙৰ ৰামটাঙোন (বড় খুঁটি) দেখি তেওঁলোকৰ মন ভাগি গ'ল (ভেঙে গেল)।"

'ৰবিকাকা'ই অর্থাৎ খুড়া শহুৰ ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যৰ তর্কাতর্কিবোৰত ভাগ লোৱা নাছিল। পিছে এদিন পৰিস্থিতি এনে হ'ল যে শহুৰ-জোঁৱাইৰ মাজত লাগিল এক তর্কযুদ্ধ। দিনচেৰেক ধৰি ইয়াৰ (কয়েকদিন ধরে এর) প্রভাৱ চলি আছিল। কিছুকাল পিছত শহুৰ ৰবীন্দ্রনাথে 'ভাৰতী' আলোচনীত (পত্রিকায়) 'ভাষা-বিচ্ছেদ' নামৰ এটি প্রবন্ধ লিখিলে। ইয়াৰ প্রতিবাদত 'অসমীয়া ভাষা' নামেৰে লক্ষ্মীনাথৰো এটা প্রবন্ধ ওলাল (প্রকাশিত হল)। শহুৰ-জোঁৱাইৰ মসিযুদ্ধৰ এটা সময়ত অন্ত পৰিছিল। জোঁৱাইৰ কাম-কাজে ৰবীন্দ্রনাথৰ মনত কিছু বেজাৰ দিছিল নিশ্চয়। এবাৰ জোঁৱায়েকক তেওঁ কৈছিল (একবার জামাইকে তিনি বলেছিলেন), 'তোমরাই আসামকে বার করে দিয়ে বাংলা ভাষার পরিসর কমিয়ে দিলে। বই লিখে ছাপা করতে গ্রন্থকারদের আর উৎসাহ থাকে কোথায়!'

অৱশ্যে পৰৱর্তী কালত ৰবীন্দ্রনাথৰ মত সলনি হৈছিল (পরিবর্তিত হয়েছিল), তেওঁৰ মনোভংগী প্রসাৰিত হৈছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদৰপৰা উদাৰ জাতীয়তাবাদলৈ, আনকি (এমন-কি) আন্তর্জাতীয় পর্যায়লৈ। লক্ষ্মীনাথৰ মৃত্যুত তেওঁ লিখিছিল—

"ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে তার আপন ভাষার পূর্ণ ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইলে তবেই পরস্পরের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দান-প্রতিদান সার্থক হইতে পারিবে এবং সেই উপলক্ষ্যেই শ্রদ্ধা সমন্বিত ঐক্যের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবনে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার এই সাধনা অতন্দ্রিত ছিলো, মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার এই প্রভাব বল লাভ করুক, এই কামনা করি।"

(৮)

ৰবীন্দ্রনাথ আছিল ব্যতিক্রম। তেওঁৰ লেখাত বা কথা-বতৰাত অসমীয়া ভাষাৰ প্রতি ব্যংগ বা বিদ্বেষৰ চোক নাছিল (তীক্ষ্ণতা ছিল না)। ভাটী বয়সত (পরিণত বয়সে) তেওঁ

কেৱল বাংলা ভাষাৰ নহয়, ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভাষাৰ বিকাশ সাধন হোৱাটো বাঞ্ছা কৰিছিল। কিন্তু লক্ষ্মীনাথৰ শহুৰেকৰ ফালৰ (শ্বশুৰেৰ দিকেৰ) আন যিসকল মানুহ আছিল, অসমীয়া ভাষাটোক লৈ তেওঁলোকে বেহ ব্যংগ-কৌতুক কৰাৰ কথা লক্ষ্মীনাথে নিজেই আত্মকথাত লিখিছে। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁৰ অন্যান্য লেখাতো। বিয়াৰ তিনি (তিন) বছৰৰ পিছত অ. ভা. উ. সা. সভাত তেওঁ 'অসমীয়া ভাষা' শীৰ্ষক এলানি (একগুচ্ছ) বক্তৃতা দিছিল। তাৰ এঠাইত বাঙালীসকলৰ ভাষিক গ্ৰাসৰ মনোবৃত্তি সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছিল—

"কোন হিচাপে যে বঙলা ভাষাটোক আমাৰ ভাষা অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা এৰি বঙলা ভাষা ল'বলৈ কয় আমাৰ চুটি বুদ্ধিৰে তাক বুজি পাব নোৱাৰো (ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিতে তা বুঝতে পারি না)। অলপ পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকে (তাঁৰা) ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ দুপাত চাৰিপাত লুটিয়াই চাই (উলটেপালটে দেখেন) যেন, কোন ভাষাৰ বিভিন্নতা কি কি কথাৰ দ্বাৰা হয় আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত সি নিৰ্ভৰ কৰে তাক বুজি পাব। বৃথা অহংকাৰ পৰিহাৰ কৰি, এখুদমান (একটুখানি) কষ্ট স্বীকাৰ কৰি যদি তেওঁবিলাকে অসমীয়া ভাষা সঁচাসঁচিকৈয়ে শিকিবলৈ (সত্যিসত্যিই শিখতে) চেষ্টা কৰে, তেন্তে (তাহলে) আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ (বলতে পারি) যে তেওঁবিলাকে নিজৰ অবিমৃশ্যকাৰিতা, অনভিজ্ঞতা আৰু অসাৰতা দেখি আপোনা-আপুনি অনুতাপিত আৰু লজ্জিত হ'ব।"

কথাখিনি দেখাত কঠোৰ, আনকি (এমন-কি) দ্বেষমিশ্ৰিত যেন লাগিব পাৰে (মনে হতে পারে); দৰাচলতে (প্ৰকৃতপক্ষে) ই আছিল অসমীয়া ভাষাটোৰ স্বৰূপ বুজিব নোখোজা (বুঝতে না-চাওয়া) বাঙালীসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেমপূৰ্ণ অভিমান। সাধাৰণভাৱে বাঙালীৰ প্ৰতি তেওঁৰ তিক্ততা নাছিল, চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীকে ধৰি অনেক বাঙালীৰ প্ৰতি তেওঁৰ অসীম শ্ৰদ্ধা আছিল। তেওঁ নিজে সেইকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাঙালী পৰিয়ালৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল। ভাষা বিষয়ক বিতৰ্কই পৰিয়ালটোৰ কোনো সদস্যৰ লগত ব্যক্তিগত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ (ফেলার) দৃষ্টান্ত পোৱা নাযায়। তেওঁ প্ৰায়বোৰ ঘৰুৱা (অধিকাংশ ঘরোয়া) চিঠি-পত্ৰ বাংলাতে লিখিছিল— তেওঁৰ বাঙালী বিদ্বেষ থকা হ'লে এনে চিঠি তেওঁ নিলিখিলেহেঁতেন (লিখতেন না)।

সবাতোকৈ ডাঙৰ (সবচেয়ে বড়) কথা, অসমত বাংলা ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ মূলত বাঙালী আমোলাৰ ষড়যন্ত্ৰ, এই যি ভ্ৰান্তিপূৰ্ণ 'তত্ত্ব' হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা প্ৰমুখ্যে তেওঁৰ বন্ধুসকলে সূচনা কৰিছিল আৰু যিটোৱে বহু কাললৈকে অসমীয়া-বাঙালীৰ মাজত তিক্ততাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল, লক্ষ্মীনাথ সেই 'তত্ত্ব'ৰ পক্ষপাতী নাছিল। আমি জানো, লক্ষ্মীনাথ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাছিল, তেওঁ আছিল স্বাধীচিতীয়া (স্বাধীনচেতা) মনৰ লোক। সেইবাবেই তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি নকৰি ব্যৱসায়ত ধৰিছিল, হেমচন্দ্ৰ-পদ্মনাথৰ দৰে ব্ৰিটিছক অসন্তুষ্ট কৰি চাকৰি হেৰুওৱাৰ (হারানোর) ভয় তেওঁৰ নাছিল। গতিকে (সুতরাং) অসমত বাংলা ভাষা প্ৰচলনৰ আচল (আসল) কাৰণ তেওঁ কিন্তু ক'ব পাৰিছিল নিৰ্ভীকভাৱে। তেওঁ বুজিছিল, বেলি ডুব নোযোৱা (সূর্য না-ডোবা) সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ব্ৰিটিছক কেইটামান বাঙালী কেৰাণী-মহৰীয়ে (-মুহুরি) ফুচুলাই (ফুসলিয়ে) অসমত বঙালী ভাষাক প্ৰৱৰ্তন কৰাটো মাখিয়ে হাতীক হেচুকিওয়াৰ দৰে (হাতিকে মাছির ঠেলা মারার মতো) কথা। শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে ব্ৰিটিছে অসমত বাংলা ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বুলি লক্ষ্মীনাথে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল। অ. ভা. উ. সা. সভাত দিয়া বক্তৃতা এটাত তেওঁ কৈছিল,—

"অসমৰ কমিছনাৰ (কমিশনার) কর্ণেল হপ্‌কিন্সচনৰপৰা আৰম্ভ কৰি চীফ কমিছনাৰ ৱার্ড (ওআর্ড) চাহাবলৈকে আসাম গভর্নমেণ্টৰ অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে টোকন (লাঠি) ধৰি আহিবলৈ ত্ৰুটি কৰা নাই। গৰ্ভনমেণ্টে মহা ভ্ৰমত পৰিয়েই এসময়ত অসমীয়া ভাষা খেদি বঙলা ভাষা সুমুৱাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰি বিষম ফল উৎপন্ন কৰিছিল। সেই চেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে খিচিৰি (খিচুড়ি) ভাষা লিখা মাজে-সময়ে (মাঝেমধ্যে) আমাৰ ক'ৰবাত (কোথাও-কোথাও) দেখা যায়।"

বেজবৰুৱাৰ যুগটো আছিল অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওপৰত, আন নালাগে (শুধু তা-ই নয়) অসমীয়া আদব-কায়দা, ধৰ্ম-সংস্কৃতি আদিৰ ওপৰতো, বাঙালী আধিপত্যৰ যুগ, বেজবৰুৱাৰ ভাষাত ক'ব লাগিলে Everything Bengaliৰ যুগ। শিৱসাগৰত স্কুলত পঢ়া কালত, তেওঁ কিছুমান বাঙালী শিক্ষকৰ বাঙালী অহমিকা দেখা পাইছিল, কিন্তু ই তেওঁৰ মনোজগতৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাছিল (ফেলতে পারেনি)। তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ্থে কলকাতাত থকা

কালতো বাঙালীৰ উচ্চাত্মিকাবোধে তেওঁক বৰকৈ স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল যেন লাগে। তেওঁ চাহাবী ধৰণ-কৰণ ভাল পাইছিল আৰু নিজৰ চাহাবী প্ৰীতিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ বাঙালীৰপৰা তেওঁ নিজকে আঁতৰাই (সৰিয়ে) ৰাখিছিল। বাংলা সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনুৰাগ আছিল, বাঙালী ছদ্মনাম লৈ বাংলা ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ কথাও ভাবিছিল। অসমীয়া ৰীতি-নীতিৰ প্ৰতিও যে তেওঁৰ খুব আগ্ৰহ আছিল তেনে নহয়। অসমীয়া হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে বিয়া নকৰাই তেওঁ বিয়া কৰাইছিল তেওঁৰ ককা শহুৰেকে (দাদাশ্বশুৰ) প্ৰচাৰ কৰা ব্ৰাহ্ম পদ্ধতিৰেহে। মহাপুৰুষীয়া (মহাপুৰুষ শংকৰদেব প্ৰবৰ্তিত বৈষ্ণবীয়) পৰিৱেশত তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল (বড়) হৈছিল, কিন্তু শংকৰ-মাধৱৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিল বিয়াৰ পিছতহে। বিয়াৰ আগলৈকে কোট-পটলুঙেই তেওঁৰ প্ৰধান সাজ আছিল।

লক্ষ্মীনাথৰ জীৱন চৰিত অনুধাৱন কৰিলে ভাৱ হয়, তেওঁৰ জাতীয়তাবোধ, বাংলাত ক'ব লাগিলে, 'পাকাপোক্ত' হৈ উঠিছিল তেওঁৰ বিয়াৰ পিছতহে। বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীৰ সম্বন্ধীয় মানুহবোৰে তেওঁৰ 'অসমীয়াত্ব'ক লৈ ব্যংগ-কৌতুক কৰিছিল, অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰে এটা হেনহুচা মাত বুলি হাঁহিছিল (একটা ত্ৰুটিপূৰ্ণ ৰূপ বলে হাসতেন), মুঠতে Everything Bengaliৰ নিদৰ্শন তেওঁ শহুৰৰ ঘৰতে পাইছিল। লক্ষ্মীনাথে ভাষাক লৈ শহুৰৰ ঘৰৰ এনে আচৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু জোঁৱাই হিচাপে তেওঁৰ প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ উদাত্ত আছিল যেন নালাগে। "তোমৰাই আমাৰ বাংলা ভাষাকে সংকুচিত কৰে আনলে"— খুড়া শহুৰ ৰবিকাকাই কৰা এনে মন্তব্য বিনা প্ৰতিবাদে হজম কৰাৰ কথা তেওঁ আত্মজীৱনীত লিখিছে।

অসমীয়া ভাষাক লৈ কৰা শহুৰৰ ঘৰৰ ঠাট্টা-মস্কৰাবোৰে লক্ষ্মীনাথক নিশ্চয় মনে প্ৰাণে দহিছিল। দহনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে নিশ্চয় তীব্ৰ হৈ উঠিছিল তেওঁৰ আত্মসন্মানবোধ তথা জাতীয়তাবোধ। 'তোমাৰ শহুৰ-পৰিয়াল বংগদেশত যেনেদৰে ওখ (উঁচু) তোমাৰ পৰিয়াল তোমাৰ দেশত তেনেদৰে ওখ। ঠাকুৰবাৰীত বিয়া কৰাই তুমি মূৰ দোঁ খুৱাই নাৰাখিবা (মাথা নিচু কৰে রাখবে না)।'— শিক্ষক চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীৰ এনে উক্তি তেওঁৰ নিজৰ আত্মজীৱনীত একাধিকবাৰ উল্লেখ কৰিছে।

লক্ষ্মীনাথৰ ব্যক্তিত্ব আছিল যেন তিনিবিধ (তিন ধৰনের) ব্যক্তিত্বৰ সমাহাৰ। প্ৰথম হ'ল ইংৰাজী। তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল ব্ৰিটিছে কঢ়িয়াই অনা (নিয়ে আসা) নব্য আধুনিকতা। নিজৰ ওপৰত, নিজৰ বৌদ্ধিক স্বাধীনতাৰ ওপৰত তেওঁৰ বিশ্বাস, বিশ্বাসতকৈও যুক্তিৰ ওপৰত, পাৰলৌকিক জগততকৈও ঐহিক জগতৰ ওপৰত তেওঁৰ আস্থা আদি ধাৰণা আদি তেওঁ পাইছিল ব্ৰিটিছৰ, বিশেষকৈ ইংৰাজৰপৰা। 'এংলো ইণ্ডিয়ান'ৰ ৰচনাত তেওঁ ইংৰাজক মৃদু সমালোচনা কৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ মহাসভাতো তেওঁ উপস্থিত আছিল। তথাপি ভাব হয়, নিজৰ 'ইংৰাজত্ব' তেওঁৰ মনৰপৰা আঁতৰাব পৰা নাছিল (তাঁৰ মন থেকে দূর করতে পারেননি)। স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে যোগ দিয়া নাছিল— সম্ভৱতঃ ব্যৱসায়ত ব্যাঘাত জন্মিব বুলিয়েই। সেইকালৰ প্ৰায়বোৰ (অধিকাংশ) নব্য শিক্ষিতৰ দৰে তেৱোঁ (মতো তিনিও) নিজৰ ছোৱালীক (মেয়েকে) ইংৰাজী শিকাইছিল, অকালতে মৃত্যু হোৱা তেওঁৰ জীয়েক (কন্যা) সুৰভিয়ে ইংৰাজী কবিতা মুখস্থ মাতিব (বলতে) পাৰিছিল বুলি তেওঁ প্ৰকাৰান্তৰে গৌৰৱো কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ নিজৰ জীয়েকহঁতক (কন্যাদের) অসমীয়া, আনকি (এমন-কি) বাংলা ভাষাও শিকোৱা নাছিল (শেখাননি)। এই ক্ষেত্ৰত আধুনিক অসমীয়া অভিজাতৰ লগত (সঙ্গে) তেওঁৰ পাৰ্থক্য দেখা নাযায়।

দ্বিতীয়তে, তেওঁৰ 'বাঙালীত্ব'। তেওঁ সলসলীয়াকৈ (সাবলীলভাবে) বাংলা কোৱাই নহয় (বলাই শুধু নয়), তেওঁ নিজৰ সাহিত্য জীৱনো আৰম্ভ কৰিছিল বাংলা ভাষাত। নিজৰ পত্নী-কন্যালৈ তেওঁ বাংলা ভাষাতে চিঠি-পত্ৰ লিখিছিল।

তৃতীয়তে, তেওঁৰ 'অসমীয়াত্ব'। বিয়াৰ আগলৈকে তেওঁৰ অসমীয়াত্ব দুৰ্বল আছিল যেন লাগে। সাধাৰণ ঘৰৰ অসমীয়া বা বাঙালী ছোৱালী বিয়া কৰোৱা হ'লে বা প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীক বিয়া কৰাই তেওঁ অসমলৈ গুচি অহা হ'লে (অসমে ফিরে এলে) বাঙালীৰ লগত তেওঁৰ অনুৰাগ-বীতৰাগৰ যি দ্বন্দ্ব, তাৰ চোক (তীক্ষ্ণতা) হয়তো ক্ৰমে কমি আহিলেহেঁতেন। কিন্তু শহুৰৰ পৰিয়ালৰ লগত ওচৰা-উচৰিকৈ (কাছাকাছি) থকাৰ ফলত তেওঁ লাহে লাহে একপ্ৰকাৰ উগ্ৰ অসমীয়া হৈ পৰিল। বাঙালীয়ে অসমীয়াক দিয়া অপবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ হাতত টঙালি বান্ধি থিয় হ'ল (কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন)। অসমীয়াৰ ভাষিক ঐতিহ্যৰ লগত সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক পৰম্পৰালৈ তেওঁৰ চকু গ'ল (তাঁর দৃষ্টি গেল)। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য

তেওঁ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে, লিখিলে শংকৰ-মাধৱৰ দুখনকৈ জীৱনী। লিখিলে অসমৰ লোক সাহিত্য সম্পৰ্কীয় কিতাপ। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বৰপৰা তেওঁ ছাগৈ (তিনি বোধহয়) মুক্ত নাছিল জীৱনৰ শেষ বয়সলৈকে। ঘৰত তেওঁ বাংলাত কথা পাতিছিল, ঘৰৰ মানুহৰ লগত বাংলাত চিঠি-পত্ৰ লিখিছিল।

কিন্তু বাহিৰত তেওঁ আছিল অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী। সকলোবোৰ দিশ চালিজাৰি চাই (বিশ্লেষণ কৰে) তেওঁ একপ্ৰকাৰৰ ভাষিক তথা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বত ভুগিছিল যেন লাগে। ভাষিক দ্বন্দ্বৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত একেই কথা। তেওঁ ব্ৰাহ্ম প্ৰথা অনুসৰি বিয়া কৰাইছিল। তেওঁৰ ঘৰত ব্ৰহ্মোপাসনাও চলিছিল। একে সময়তে তেওঁ আছিল অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিও একান্ত অনুৰাগী। তাল-খোলৰ মাজেৰে (খোল-কৰতাল বাজিয়ে) তেওঁ মাজে মাজে তেওঁৰ বাঙালী চুবুৰীয়াক (প্ৰতিবেশীকে) কৰি তুলিছিল চমকিত। অৱশ্যে এইবোৰক দ্বন্দ্ব নুবুলি তেওঁৰ চাৰিত্ৰিক উদাৰতাৰ পৰিচয় বুলি ভবাই যুগুত হ'ব (বলে ভাবাই যুক্তিসংগত হবে)। মাৰ্কিন কবি হুইটমেনৰ দৰে তেৱোঁ ছাগৈপেটে পেটে ভাবিছিল (হুইটম্যানের মতো তিনিও বোধহয় মনে মনে ভেবেছিলেন) — 'I am large, I contain multitudes.'

এই কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি লক্ষ্মীনাথৰ মানসিকতাৰ প্ৰধান কাৰক আছিল তেওঁৰ যুগৰ বাঙালী সমাজ। অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ নেতাৰূপে লক্ষ্মীনাথৰ আজি যি পৰিচয় সি এনেয়ে হোৱা নাই (সেটা এমনি-এমনি হয়নি)। তাৰ একাধিক কাৰণৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল, আমাৰ মতেৰে— বাঙালী সমাজৰপৰা, বিশেষকৈ অসমীয়া হোৱা হেতুকে তেওঁৰ শহুৰ বংশৰপৰা তেওঁ সহিব লগীয়া হোৱা ব্যংগ আৰু কৌতুক। ইতিবাচক দিশৰপৰা চাবলৈ গ'লে (দিক থেকে দেখতে গেলে) লক্ষ্মীনাথে ঠাকুৰ পৰিয়ালত বিয়া কৰোৱাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে প্ৰকাৰান্তৰে এক পৰম সৌভাগ্য। বংগীয় পৃষ্ঠভূমি নথকা হ'লে (না-থাকলে) লক্ষ্মীনাথে আজি আমাৰ মাজত যি ৰূপে পৰিচিত, তেনে (তেমন) পৰিচিতি হয়তো আমি নাপালোহেঁতেন (আমরা পেতাম না)। ❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

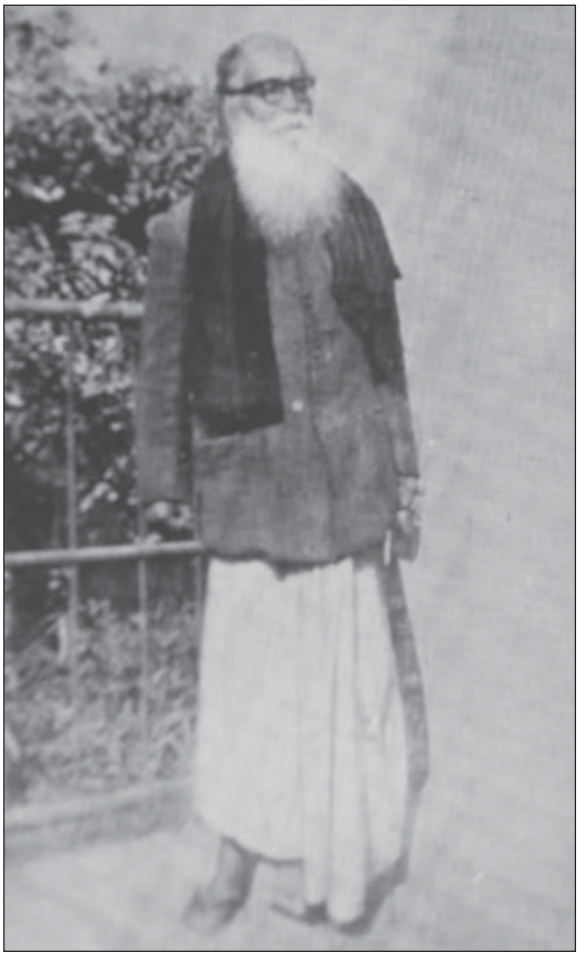

স্বামী চণ্ডিকানন্দের ফোটোটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী গোপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পুত্র শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত

এই ধরাধামে কখনো কখনো এমন মানব অবতীর্ণ হন, যাঁরা আমাদের অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসিয়ে দেন। তাঁদের পুণ্য জীবনকথায় আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত হতে হয়। অবশ্য এইসব পুণ্যশ্লোক মনীষীর প্রারম্ভিক জীবন এবং প্রান্তিক জীবন মেলানো ভার, যিনি চণ্ডাশোক তিনি তো পরিণত জীবনে ধর্মাশোক হয়ে জনচিত্তে মথিত হলেন। প্রকৃত কথা, একজন মানবের সমগ্র জীবনের ইতিবৃত্তের প্রেক্ষিতে জনমনে তাঁর বিকর্ষণ-আকর্ষণ চিহ্নিত হয়। তবে এ-কথাও সত্য, প্রাথমিক স্বেচ্ছাচারী মানুষ কালক্রমে আপনার কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে পরবর্তী সময়ে জনগণের মঙ্গল কামনায় নিবেদিত হন। তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ হয়ে নীরবে-নিভৃতে সদা শুভ-কর্মপথে আপনাকে অন্বিত করেন। তিনি নির্মল আনন্দ নিয়েই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বনাম চণ্ডিকানন্দ মহারাজ তারই বিতত তুলন।

পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রামের বিদ্যাভূষণ পাড়ায় জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা গিরিজা বিশ্বাস সমাজে রায়সাহেব হিসাবে পরিচিত এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামে 'ভিলেজ কোর্ট' চালু করেছিলেন। অন্যদিকে মাতা সৌদামিনী দেবী স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মন-প্রাণ-হৃদয়ে অসাধারণ মহিলা ছিলেন। এককথায়, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাবা-মা পূর্ণ সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিলেন। এই রায়সাহেবের শরিকি বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। বিশাল নাটমন্দিরে দুর্গাপ্রতিমা বসিয়ে আত্মজন ও গ্রামের লোকজন আনন্দে মেতে উঠতেন।

১৯১৮ সালে শ্রীশ্রীসারদা দেবী (২২.১২.১৮৫৩-২১.৭.১৯২০) ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন। এই সময় স্নাতক শিক্ষার্থী জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। এরপর জিতেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী হন। তাঁর নাম হয় স্বামী চণ্ডিকানন্দ। বলা বাহুল্য, তিনি আর স্নাতক শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করেননি। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের একটি সকরুণ ইতিহাস আছে।

দশম শ্রেণির ছাত্র নাবালক জিতেন্দ্রনাথ পিতার উপর আক্রমণকারী চরম শত্রু ছবু মিয়ার বাবাকে বর্শায় আহত করেছিলেন। কারণটি ছিল, বিদ্যাভূষণ পাড়ায় সরকারি পুকুরের পশ্চিম পারের ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকজন রায়সাহেব গিরিজার পুকুর-পাড় দিয়ে গবাদি পশুকে পাড়ার পশ্চিমের বিস্তীর্ণ মাঠে নিয়ে যেত। গবাদি পশুর চলাচলের পথটি গোপাট হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এই নিয়ে গিরিজাবাবু আপত্তি জানালে ছবু মিয়ার বাবা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সেই মতো ছবু মিয়ার বাবা গিরিজা বিশ্বাসকে এক শীতকালের সন্ধ্যায় আপাত অনাবিল বন্ধুত্বের দাবিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো দা দিয়ে বারংবার আঘাত করে। এর ফলে গিরিজা বিশ্বাস মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পিতার এই বিপন্নতায় পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ছবু মিয়ার বাবাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করেন। এই অপকর্মের জন্য নাবালক হিসেবে তাঁর একদিনের জেল হয়েছিল। মতান্তরে এ-কথাও শোনা যায়, তাঁর কোনো সাজা হয়নি। এইটুকুই জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানগত তথ্য মিলেছে। এঁর বাকি জীবন স্বামী চণ্ডিকানন্দ হিসেবে আত্মীয়-পাঠক-উত্তরসাধকের কাছে সুবিদিত।

পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য এবং নিজকৃত অপকর্মের অনুশোচনা জিতেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল। বোধ করি তিনি বুঝেছিলেন, পিতৃমাতৃদত্ত 'জিতেন্দ্রনাথ' নামটির সুগভীর ব্যঞ্জনাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হলে জগৎপ্রপঞ্চে আশ্লিষ্ট হলে চলবে না। তাই তিনি দেবীমাহাত্ম্য-কথায় অপার আনন্দে নিমগ্ন হওয়ার বাসনায় জগজ্জননী সারদার কাছে দীক্ষান্তে চণ্ডিকানন্দ নামটি গ্রহণ করলেন। আর রূপ নয়, যৌবন নয়, ধন নয়, যশ নয়, প্রথাগত শিক্ষাও নয়; এখন আত্মোপলব্ধি আর সর্বমানবের হিতসাধন হল তাঁর পথ ও পাথেয়। বিশেষত তিনি স্বামী শিবানন্দের কাছে সন্ন্যাস লাভ করার পর তাঁর চিত্তের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-সব সন্ন্যাসী কণ্ঠসংগীতে ও সংগীত-রচনায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন, স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি প্রতিদিন তাঁর জীবন-দেবতার উদ্দেশে সুমধুর সংগীত-লহরি উৎসর্গ করেছেন, সংগীতের ভাববন্যায় নিজে ভেসেছেন, সবাইকে ভাসিয়েছেন।

এঁর আসল কর্ম শিশুজগতে বাস করে তাদের মানুষ করা। ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের পর ইনি যেখানেই বাস করতেন সেখানেই শিশুদের নিয়ে থাকতেন। তাদের জন্য আদর্শ সংঘ প্রস্তুত করেছিলেন। তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করতেন।

বহু বাঙালি, অসমিয়া, খাসি, নেপালি এঁর ভাবে অনুপ্রাণিত। ইনি খাসি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের সব গ্রন্থই আজ দুষ্প্রাপ্য। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থটিই (প্রকাশক 'উদ্বোধন' কার্যালয়, ১ উদ্‌বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা : ৭০০ ০০৩, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মে ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯) পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে স্বামী নিরাময়ানন্দ লিখেছেন, "ভগবৎ কৃপায় পাঞ্চজন্যের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে সঙ্গীতকার স্বামী চণ্ডিকানন্দজির স্বরচিত ৬৪টি গান ছিল। উহাদের অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে 'বিবেক গীতি'-শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে; কিছু গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং নূতন কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে। গানগুলিকে নূতন ভাবে সাজানো হইয়াছে এবং প্রথম অধ্যায়ে ৫৬টি গান স্থান পাইয়াছে। এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত নয়টি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে—

মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানবসঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি, বিবিধ সঙ্গীত ও প্রতিধ্বনি।"

প্রতিধ্বনি অধ্যায়ের সদুত্তরও স্বামী নিরাময়ানন্দ দিয়েছেন— "এই গ্রন্থের 'প্রতিধ্বনি'-অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বাংলা সঙ্গীতপুস্তকে হিন্দী, কানাড়া, গুজরাটি, ওড়িয়া, খাসিয়া, অসমিয়া প্রভৃতি গানের সংকলন কেন করা হইয়াছে, এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগা স্বাভাবিক। গ্রন্থকার অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষাতেও গান গাহিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার গান প্রাদেশিকতা বর্জিত হওয়ায় উহা গাহিয়া এবং শুনিয়া ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস— ভারতে জাতীয় সংহতি সাধনের পথে 'প্রতিধ্বনি'-অধ্যায়টি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।" (প্রাগুক্ত 'নিবেদন' অংশ, ৩০ জানুআরি ১৯৭০, পৃষ্ঠা খ)

পাঞ্চজন্য গ্রন্থটি নিয়ে এটুকু হল প্রাথমিক কথা। পরে এই গ্রন্থ নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে। স্বামী চণ্ডিকানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ হল 'ছেলেদের গান' (প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার শ্যাম, মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট, প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮), এই গ্রন্থটির আরও তিনটি সংস্করণ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪১, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৪৬, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) হয়েছিল। ছেলেদের গান বইটি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি সংগীত সমন্বিত। গ্রন্থটিতে 'মাতৃসঙ্গীত', 'শিবসঙ্গীত', 'বিবিধ সঙ্গীত' ও 'মহামানবসঙ্গীত' নামক চারটি বিভাগ রয়েছে।

'সারদা-সঙ্গীত' (প্রথম সংস্করণ শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকা পূজা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার চণ্ডিকানন্দ স্বামী লিখেছেন, সারদা মায়ের আগতপ্রায় শতাব্দী জন্মজয়ন্তী (১২৬০-১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) উপলক্ষ্যে গানগুলি রচিত। স্বামী প্রেমেশানন্দ ভূমিকায় লিখেছেন, "আত্মবিস্মৃত সন্তানদিগকে কোলে তুলিয়া নিবার জন্য আমাদের মা বারবারই মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন। এবারকার প্রকাশ সর্বাধিক সমুজ্জ্বল । তাঁহার অনুপ্রেরণাধীন হইয়া শ্রীমৎ স্বামী চণ্ডিকানন্দজী যে সব মহিমা-কীর্ত্তন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠক গায়ক শ্রোতা সকলেরই কল্যাণ সাধন করিবে।" (বেলুড় মঠ, ৬ বৈশাখ ১৩৫৯)

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গ্রন্থটি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিককে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) স্মরণে রেখে উক্ত সনে প্রকাশিত হয়েছিল। 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গন্থটি (১৯৬২) রচনার আগেও তিনি আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি হল 'তরুণের গান' (প্রকাশক-সম্পাদক স্বামী সৌম্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, প্রকাশের তারিখ ২৮.৬.১৯৫৬)। 'উদ্বোধন' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৫, পত্রিকাটি প্রথমে পাক্ষিক ছিল, প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত, দশম বর্ষ ১৩১৪-১৩১৫ থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকা মাসিকপত্র হিসেবে রূপান্তরিত হয়।) সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'তরুণের গান' বইটির সংক্ষিপ্ত-মর্মস্পর্শী ভূমিকা লিখেছেন। এই ভূমিকাটি হল—

"শ্রদ্ধেয় স্বামী চণ্ডিকানন্দজির 'তরুণের গান' সঙ্গীতের মাধ্যমে বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীদের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি ও সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের পরিপোষক— শুচিতা, স্বার্থত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং মানব সেবা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করিবার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। লেখক এই প্রচেষ্টায় যে বহুলাংশে সফল হইয়াছেন তাহা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ গীতগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ সঙ্গীত-

গুণী এবং দীর্ঘকাল ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে থাকিয়া তরুণ মনস্তত্ত্বে পারদর্শী। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার রচনায় সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

"উচ্চ আদর্শের প্রতি প্রীতি এবং উহার অনুশীলনের জন্য অনলস অধ্যবসায় দেশের ভাবী মানুষদের ভিতর যাঁহারা উদ্বুদ্ধ করিবার সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁহাদের একজন। তাঁহাকে এবং তাঁহার 'তরুণের গান'কে অভিনন্দিত করি।"

'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' (দুটি পর্ব) কথিকা সহ গ্রন্থটির প্রকাশক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪, প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬২)। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে স্বামী চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন, "যাঁহার আশীর্বাদ, উৎসাহ ও প্রেরণায় এই লীলাগীতি রচনা সম্ভব হইয়াছে, সেই পরম পূজনীয় সঙ্ঘগুরু বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর করকমলে।" তিনি 'নিবেদন' অংশে আরো লিখেছেন, সাধারণ সম্পাদক সম্বুদ্ধানন্দজি গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় তা বহুল প্রচারের পথ সুগম হয়েছিল। শিলঙের বহুজন-শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী অশ্বিনীকুমার শর্মা পুস্তকখানির কথিকা অংশগুলি লিখে দিয়েছিলেন। চণ্ডিকানন্দের রচিত নয় এরূপ কয়েকজনের সংগীতও পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, স্বামী সারদানন্দ, তুলসীদাস, সুরদাস, যদু ভট্ট, অশ্বিনীকুমার শর্মা ও স্বামী প্রেমেশানন্দ। এমন-কি বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের একটি পদ ('যদি গোকুল-চন্দ্র ব্রজে না এলো') এখানে প্রাসঙ্গিকতায় সংকলিত হয়েছে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের স্বরলিপি সহ 'ভজন সঙ্গীত' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই 'ভজন সঙ্গীত' গ্রন্থের পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের (প্রথম ভাগের পূর্বাংশ, প্রকাশক : স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটি, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, প্রকাশকাল ১৩৮২ বঙ্গাব্দ) 'উৎসর্গ' পত্রে 'চিরপ্রণত সেবক' চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন, "আমার পরম পূজনীয় সঙ্গীতগুরু শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের শ্রীশ্রীকরকমলে উৎসর্গ করিলাম।" গ্রন্থটিতে সহজ উপায়ে সংগীত শিক্ষার প্রণালি দেওয়া আছে।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা ভালো, স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'গীতাবলী' গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণের সংগীত সংকলিত হয়েছে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ খাসি ভাষা জানতেন। তাঁর খাসি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি হল— Ka Jingrwai India (Students' edition), Ka Jingrwai Kyrsiew, U. Ramkrishna, Ka Sarada Devi (ka la jan mih), U Swami Vivekananda (Kan Sa mih)।

এই হল স্বামী চণ্ডিকানন্দের গ্রন্থগুলির সাধারণ পরিচয়। এবার তাঁর জনহিতকর কাজগুলিও আলোচিত হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, চণ্ডিকানন্দের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল শিশুজগতের উন্নতি সাধন। সুনামগঞ্জ শহরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তার পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। অনেক অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক ও ভক্তদের নিয়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধ বিতরণ ও আর্তের সেবা করতেন। তিনি রোগীদের জন্য একটি নার্সিং ক্লাব ও সৎকার্য সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে শিলং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী চণ্ডিকানন্দের লেখা একটি বিজ্ঞাপন 'মানুষ হও' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি চোদ্দ-পনেরো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যার মূল আবেদন ছিল— আমাদের প্রকৃত মানুষ হতে হবে। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীন তিনি মিশনের ভাবধারায় উজ্জীবিত করার জন্য মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে গান শেখাতেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর কপালেও অপবাদ জুটেছিল। কোনো কোনো মহারাজ তাঁর সম্বন্ধে চরিত্রহীনতার কথা তোলেন। এই অমূলক নিদারুণ অপবাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এর পর বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠান। সেখানে তিনি শিশুদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধবয়সে তাঁকে বেলুড় মঠে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমাবাসে বিশ্রামের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত স্বল্প রোগভোগের পর স্বামী চণ্ডিকানন্দ ২৭ জানুআরি ১৯৮৩ সালে কলকাতার রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে রামকৃষ্ণলোকে অনন্তকালের জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

স্রষ্টার জীবনদীপ নির্বাপণের পর তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি ও সৃষ্টির দিকটি ভাবীকালের পাঠক ভেবে দেখেন এবং পাঠকের সেই ভাবনায় স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষণত্ব-স্থায়িত্ব নিরূপিত হয়। স্বামী চণ্ডিকানন্দও এই নিয়মে মানবসমাজে অন্বিত।

মহামানবের সকল কর্মকাণ্ড আমরা ভুলে যেতে পারি। কিন্তু ভুলতে পারি না তাঁর এমন কিছু সৃষ্টিসাধনা যা আমাদের শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে উপনীত করে। স্বামী চণ্ডিকানন্দ শুধু সংগীতের জন্যই মানবহৃদয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-কথা খুবই জরুরি। তিনি লিখেছেন, "আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে— প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম—

যবে কাজ করি— প্রভু দেয় মোরে মান;

যবে গান করি— ভালোবাসে ভগবান।

এ কথা বলি কেন? এইজন্যে যে, গানে যে-আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন করে নতুন করে।" (আলাপ-আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, তারিখ ৯ জুন ১৯৩৮, গ্রন্থ : সংগীত, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪৫)

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের (চণ্ডিকানন্দ প্রণীত, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯) ভূমিকায় লিখেছেন, "ভাবের বাহক ভাষা; সেই ভাষা সুরে-ছন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে মানব-হৃদয়ে দোলা দেয়, তখনই হয় ভাবের পরিপূর্তি। তাই ভাবোদ্দীপনায় সঙ্গীতের মত ললিতকলার প্রভাব অভাবনীয়। সঙ্গীত-কুশলী স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'মনুষ্য-মনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব, উহা মুহূর্তে একাগ্রতা আনিয়া দেয়। অতিশয় তামসিক জড় প্রকৃতি ব্যক্তিরা— যাহারা এক মুহূর্তও নিজেদের মনকে স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।'"

এইসব কথায় প্রমাণিত হয় যে, সংগীতবিদ্যার মতো অপর কোনো বিদ্যা নেই। আর এই সংগীতবিদ্যায় স্বামী চণ্ডিকানন্দ অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল জনচিত্ত মথিত করেছিলেন। তাঁর গানের ভাষা ছিল সহজ, ভাবের গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী। তিনি সংগীত রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত সাবলীল গানগুলি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন সৃষ্টি করায়। সাঁওতাল, খাসি, নাগা, মিজো, মিকির, মিরি, রাজবংশী, মণিপুরি, নেপালি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর রচিত গানগুলি প্রশংসা লাভ করে। এমন-কি ভারতের বাইরেও তাঁর রচিত গানগুলি সমাদৃত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সকলেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর সংগীতকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। আসল কথা, এই পাগল-প্রেমিক-সাধক-চণ্ডিকানন্দের অন্তরের সাধনাই তো ছিল সংগীত।

'ছেলেদের গান' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) গ্রন্থটিতে মোট ২৭৮টি সংগীত রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ 'আশীর্বাণী'-তে সংগত কারণেই লিখেছেন, "এই গানগুলির সহজ ও সুললিত রচনা ও সুর বিন্যাসের মধ্যে তরুণ প্রাণে উচ্চ ভাব ও আদর্শ উদ্দীপিত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে।" (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, লখনউ, ১০ এপ্রিল ১৯৪৫)

মায়ের রূপ ও স্বরূপ ছোটদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তাঁর শিব ও রুদ্র ভাবটিই 'ছেলেদের গান' গ্রন্থে বেশি স্থান জুড়ে আছে। মাকে শুধু বরাভয় রূপে দেখলে চিত্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁকে ভয়ংকরীরূপে দেখতে শেখা ছেলেবেলাতেই আরম্ভ হওয়া উচিত। এতে চিত্ত দৃঢ় ও সবল হয়, সাহস বাড়ে— ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিকূল পরিবেশে ছেলেরা মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পায়। আর মায়ের শিবভাব বা মঙ্গলরূপ তো তাঁর সন্তানের প্রতি থাকবেই। চণ্ডিকানন্দ ঠিকই বুঝেছেন, ছেলেদের কাঙ্ক্ষিত মন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে চায়। চণ্ডিকানন্দের বাণীতে তাই আমরা ছেলেদের অন্তরের কথা শুনি—

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।

('মাতৃসঙ্গীত', পৃষ্ঠা ৫৮)

ছেলেরা হৃদয়ের শোণিতকে তপ্ত করে, ভীতির অশ্রুকে বিদূরিত করে বিশ্বসভায় দেশের মায়ের মান রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। কারণটি ছেলেদের কাছে অতি স্পষ্ট—

মানুষ আমরা নহি ত মা'হীন
তুই যার মা' সে কি কভু দীন

তবে কেন মিছে পড়ে থাকা পিছে
কেন এ অলীক লাজ। (প্রাগুক্ত)

দেশের সংকট সময়ে তারা মায়ের রুদ্ররূপ দেখতে চায়—

এসো এসো এসো এসো মা' আমার
দশপ্রহরণ ধারিণী
হাস মা' অট্ট অট্ট হাস্য
ভূলোক দ্যুলোক নাদিনী। (প্রাগুক্ত)

ছেলের দল মায়ের রুদ্ররূপে অভিষিক্ত হয়ে যা করবে তা হল—

(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ দ্বন্দ্ব
সাধিয়া তোমারি কাজ।। (প্রাগুক্ত)

ভারতের পরাধীনতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গবিভাগের অপচেষ্টা স্বামী চণ্ডিকানন্দের চিত্তকে অশান্ত করেছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের দেশে আমরাই বিপন্ন। সমকালের ভাবনায় ভাবিত হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে একমাত্র ছেলের দলই এগিয়ে যেতে পারে। তাই ছেলেদের মনের কথা তাঁর কলমে উঠে এসেছে—

পথের 'পরে বিপদ পেলে
দলতে পারি পদতলে
(মোদের) হুংকারেতে সাগর শুকায়
পাহাড় পড়ে ঢলে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩)

কারণ ছেলের দল অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। তারা মা-অভয়ার সন্তান। তারা বিশ্ব বিজয় অভিযানে তৎপর। কারণ—

ত্যাগের বর্ম অঙ্গে মোদের
নাহি নাহি ভয় আর মরণের
সেবার শাণিত কৃপাণে আমরা
নাশিব অ-শিবে এ বসুধার।
('বিবিধ সঙ্গীত', পৃষ্ঠা ৬৮)

এই ছেলেদের প্রতিজ্ঞা একনিষ্ঠতায় অনাবিল—

নব জাগ্রত ভারত মাতার সন্তান মোরা উচ্চশির
মুছাব আমরা ধরার কালিমা সঞ্চিত শত শতাব্দীর।
(প্রাগুক্ত)

ছেলেরা বিবেকানন্দকে তাদের সেনাপতি হিসেবে জেনেছে, মা অভয়ার বাণী শুনেছে, এখন তারা নির্ভীক মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত—

বিবেকানন্দ সেনাপতি ঐ
হুংকারে ঘন "মাভৈঃ মাভৈঃ
সব সন্তান হও আগুয়ান
পশ্চাতে ফিরে চেয়ো না আর।।"
(প্রাগুক্ত)

এখন তারা বুঝেছে চলাই জীবন, থেমে থাকাই মৃত্যু—

শুনেছি এবার অভয়ার বাণী
গেল সংশয় চিত্তের গ্লানি
আর কারে ভয় আর কারে মানি
যাই যাই পড়ে রব না আর। (প্রাগুক্ত)

এই ছেলেরা তো বীরের জাত। তারা রণে দুর্দম। বিপদ তাদের কাছে নিছক খেলা। আরো ভালো করে জানে, তারা উত্তরপুরুষ হিসেবে পূর্বপুরুষের পূতরক্ত শরীরে বহন করে চলেছে। তারা মহাভারত, উপনিষদ, পুরাণ পাঠান্তে গর্বিত। তাদের বংশলতিকায় আছেন ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, মুনি দধীচি ও নচিকেতা। কাজেই দেশের সংকটে ছেলেরা শপথ নিচ্ছে—

আজ কি তুচ্ছ স্বার্থে মজে
থাকব মোরা ভয়ে লাজে?
দেশের সেবায় দেব এবার
আত্ম বিসর্জন।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯)

ছেলেরা শক্তিতে কম নয়। কারণ তারা মহামায়ার জাত। ইন্দ্র-চন্দ্র-যম তাদের ভয়ে কেঁপে মরে। তাদের সীতার চোখের জলে লঙ্কাপুরীর রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, দ্রৌপদীর অভিশাপে দুর্যোধনকে নানা যন্ত্রণা নিয়ে মরতে হয়েছে। তাই ছেলেরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে—

আমরা যখন মনে করি
অসি ধরি নাশি অরি
দেশের তরে হেসে করি
আত্মবিসর্জন।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০)

ছেলেরা বিশ্ববোধে অন্বিত। তাই তারা অবাধে বলতে পারে—

বীর মোরা সবাই— বীর সবাই
বিশ্বরাজার ছেলে মোরা— আমরা সবে ভাই।।
ভালো কাজে সবার আগে

আমরা ছুটে যাই
মন্দ যাহা মিথ্যা যাহা
আমরা তাতে নাই।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১)

আমরা আমাদের প্রাণেষ্ট পরমেশকে মন্দিরে-স্বর্গে খুঁজে বেড়াই। তাঁর স্থান তো আমাদের হৃদয়ে, তিনি তো অন্তর্যামী, তাই চণ্ডিকানন্দের ছেলের দল প্রাথমিক ভুল শুধরে বলে ওঠে—

ভেবেছিলুম লুকিয়ে আছ
স্বর্গেতে আর মন্দিরে।
আজকে দেখি ব্যক্ত তুমি
সবার 'আমি'র অন্তরে।।
ব্রহ্ম হতে পরমাণু
সকলি তো তোমার তনু
সেব্য তুমি সেবক তুমি
ব্যাপ্ত লোক লোকান্তরে।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬)

ছেলেদের মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্নতা নেই, কপটতা নেই। তারা সত্যকে সহজে বরণ করে নিতে পারে—

ধন্য হল আমার জীবন
খুলল এবার অন্ধ নয়ন
সফল হল জন্ম মরণ
আমাতে তোমায় হেরে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬)

ছেলেরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। ছেলেবেলা তো চেতনা-প্রত্যুষের কাল। তাই তাদের প্রাণময় প্রার্থনা—

শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও
পরা অপরা বিদ্যা দাও দিব্য চেতন দাও।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০)

জীবন দেবতার কাছে ছেলেরা কর্মে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, নির্মল শুভবুদ্ধি, দিব্য চেতনা, জ্ঞান গরিমা, ত্যাগে মতি ও সেবাতে প্রীতি প্রার্থনা করে। তারা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভেদবুদ্ধি চিরতরে মুছে ফেলতে চায়। তাদের প্রাণের ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদনের ভাষা হল—

এ নব যুগের নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০)

কালের অনিবার্য নিয়মে ছেলেরা একসময় নবযৌবন লাভ করে। তারা সমাজের নানা অসাম্যের প্রতিবিধান করতে না-পারার বেদনায় ব্যথিত হয়। এ-কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ কিশোরের সম প্রাণ নিয়ে বুঝেছেন। তাই তাঁর 'তরুণের গান' (প্রথম প্রকাশ : ২৮.৬.১৯৫৬) গ্রন্থটির পাতায় পাতায় পরান জাগানোর প্রাণময় মন্ত্রোচ্চারণ। স্বামী চণ্ডিকানন্দ মনে-প্রাণে সংগীতসাধক। তিনি বোঝেন, কথা-সুর-তাল-লয়ে অন্বিত সংগীত সকল মানবকে সমপ্রাণে অন্বিত করে। তাই তাঁর 'তরুণের গান'-এর প্রস্তাবনা সংগীতময়। যা কালের প্রেক্ষিতে তরুণ-ভাবনায় নিবেদিত। তিনি এমন গান আর গাইবেন না, যা তরুণের ঘুম পাড়ানোর সহায়ক হয় এবং হতাশার ব্যথায় তাদের প্রাণ কাঁদায়। তরুণের মনোবল হরণ করার মতো আর কোমল গান নয়। কারণ তাতে আছে সুরা সেবনের মতো আচ্ছন্নতা। তাই তাঁর জীবন-বীণায় মহারুদ্রতানে সুরের মূর্ছনা ওঠে—

গাইব আজি মেঘমন্দ্রে
আশার গীতি নবীন ছন্দে
বাজাব আজ জীবন বীণায়
মহা রুদ্রতান।
জাগবে পরান থাকবে না ভয়
ঘুচবে লজ্জা হবেরে জয়
জীবন মরণ সফল হবে
হাসবে ভগবান।।

প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো, 'তরুণের গান' (প্রথম প্রকাশিত : মহালয়া ১৩৬৩) বইটিতে এই গানটি ('গাইব না আর নিরাশ ভরা') 'প্রস্তাবনা' অংশে আছে। আবার 'ছেলেদের গান' (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) বইটিতে এই একই গান ৫৯তম গান হিসেবে ছিল। কিন্তু 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (মাঘ ১৩৯২, ফেব্রুআরি ১৯৮৬) এবং তৃতীয় পুনর্মুদ্রণে (জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মে ২০১১) গানটি 'বিবেকগীতি' অংশে (উভয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায়) স্থান পেয়েছে। সেখানে সূচিপত্রে অথবা গ্রন্থের কোথাও 'তরুণের গান' অথবা 'ছেলেবেলার গান' কথাটির উল্লেখ নেই। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) শুধু 'বিবেক-গীতি' অংশটুকু আছে। সেখানেও উক্ত গানটি নেই। আবার 'ছেলেদের গান' ও 'তরুণের গান' বই দুটিতে ২৯টি গান একই আছে। গানগুলি হল—

গান	ছেলেদের গান (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩)	পৃষ্ঠা	তরুণের গান (মহালয়া ১৩৬৩)	পৃষ্ঠা
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর	মাতৃসঙ্গীত	৫৮	বিভাগ নেই	১৭
অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা	বিবিধ সঙ্গীত	৬৮	বিভাগ নেই	৪
আবার যদি এলে হরি	মহামানবসঙ্গীত	১৪০	বিভাগ নেই	৩১
আমরা মহাবীরের জাত	বিবিধ সঙ্গীত	৬৯	বিভাগ নেই	২
আমরা মহামায়ার জাত	বিবিধ সঙ্গীত	৭০	বিভাগ নেই	৩
আমরা সবে তাঁরি ছেলে	বিবিধ সঙ্গীত	৭২	বিভাগ নেই	৭
আলোর দেশের যাত্রী মোরা	বিবিধ সঙ্গীত	৭৭	বিভাগ নেই	৮
কে তুমি তাপস কাঁদিছ কাতরে	মহামানবসঙ্গীত	১৩২	বিভাগ নেই	৩৪
কে বলে রে আমরা পাপী	মাতৃসঙ্গীত	২০	বিভাগ নেই	৯
ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূর্তি ধরিয়া	মহামানবসঙ্গীত	১১৪	বিভাগ নেই	২৭
গাইব না আর নিরাশ ভরা ঘুম পাড়ান গান	বিবিধ সঙ্গীত	৭৮	বিভাগ নেই	(প্রস্তাবনা)
জগত জননী জাগিয়াছে আজি	মাতৃসঙ্গীত	৩৯	বিভাগ নেই	১৬
জাগিল জননী আজি, জাগো	মাতৃসঙ্গীত	৩৪	বিভাগ নেই	১৫
'জাগো জাগোরে' বলে কে ঐ ডাকিছে রে	মহামানবসঙ্গীত	১১২	বিভাগ নেই	২৮
তুমি কি গো শুধু খেয়েছিলে ননী	মহামানবসঙ্গীত	১০০	বিভাগ নেই	৩৮
দাও তেজ তেজোময় চিত্তে আমার	বিবিধ সঙ্গীত	৮০	বিভাগ নেই	৪৮
দানব-দলনী জননী মোদের দানবের ভয়	মাতৃসঙ্গীত	৫৭	বিভাগ নেই	১৮
পাঞ্চজন্য শোন, শোন সবে পাতি কান	মহামানবসঙ্গীত	১৩৪	বিভাগ নেই	৩২
বাজাও বাজাও আবার বাজাও	মাতৃসঙ্গীত	৬১	বিভাগ নেই	৩৬
বীর মোরা সবাই— বীর সবাই	বিবিধ সঙ্গীত	৭১	বিভাগ নেই	৬
বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ	মহামানবসঙ্গীত	১১৩	বিভাগ নেই	২৫
মরণ আর কি দেখাও ভয়	মাতৃসঙ্গীত	২৫	বিভাগ নেই	৪২
মরতে হবে পরের তরে	বিবিধ সঙ্গীত	৭৬	বিভাগ নেই	৪২
মুণ্ডমালা ফেলে কেন সাজলি মা তুই বনমালী	বিবিধ সঙ্গীত	৭৯	বিভাগ নেই	১২
রাখ মোরে তব বাহিনীতে প্রভু	বিবিধ সঙ্গীত	৯০	বিভাগ নেই	৪৮
লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি	বিবিধ সঙ্গীত	৭৪	বিভাগ নেই	১০
শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও	বিবিধ সঙ্গীত	৮০	বিভাগ নেই	৪৭
সকল দেশের ভগবান	মহামানবসঙ্গীত	১৪২	বিভাগ নেই	৫০
সিংহ বাহিনী জননী মোদের	মাতৃসঙ্গীত	৫৫	বিভাগ নেই	২০

এই গানের পরিসংখ্যানের কারণ হল স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'তরুণের গান'-এ কার্যত ১৬টি নতুন গান রয়েছে। বাকি ২৯টি গান 'ছেলেদের গান' থেকে সংকলিত হয়েছে। শৈশবের অবোধ দুর্মর স্মৃতিকে সত্য অন্বেষণে জাগরূক করা সংগীতসাধকের লক্ষ্য ছিল। তরুণের গানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নতুন গানগুলি হল— 'আমরা তরুণ দল', 'এক হব তব পতাকাতলে',

‘নিশিদিন নিজের সুখের লাগি’, ‘বাজাও বাজাও ডঙ্কা বাজাও’, ‘বিবেক আহ্বান এসেছে’, ‘ভারত আমার জননী আমার’, ‘মা আমাদের মানুষ কর’, ‘দেবতাই মানুষ’, ‘এ মহা বারতা’, ‘শৌর্য দাও শক্তি দাও’, ‘সামনে যা এগিয়ে যা সন্তান সব আজ’।

এইসব গানের প্রতিটিতে তরুণদের দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করবার গভীর বাণী আছে। স্বামী চণ্ডিকানন্দ সহজ অথচ নিটোল কথায় ‘মানুষই দেবতা’ (পৃষ্ঠা ৩৩) এ-কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর আত্মোপলব্ধির ভাষা সর্বজনীন—

আপনারে যবে করি অপমান
অন্তরে বসে কাঁদে ভগবান
তোমাতে আমাতে নাহি ব্যবধান
জেনে এ তত্ত্ব জাগিল প্রাণ।

(তরুণের গান, পৃষ্ঠা ৩৩)

স্বামী চণ্ডিকানন্দের ‘সারদা-সঙ্গীত’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) বাৎসল্য রসের আকর গ্রন্থ। এখানে সংগীত-সাধক মায়ের স্নেহের মধ্য দিয়ে শিশু যে কী পরম বিস্ময় ধারণ করে তা ৬৫টি গানে অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন। ‘সারদা-সঙ্গীত’-এর প্রথম গানে আছে সন্তানের জন্য মায়ের চিত্ত আকুল—

কে ডাকে আয় আয় বাছা ফিরে আয়
মোর তরে সদা কার আঁখি ঝরে করুণায়।।

শেষ গানে আছে সন্তানের সহজ-গভীরভাবে মাকে পাওয়ার আকুতি আর অকপট আত্মসমর্পণ—

তন্ত্র মন্ত্র উপাসনা
জানি না কোনো সাধনা
‘মা’ নামে তোর আরাধনা
করব এবার প্রাণ-পণে।

(সারদা-সঙ্গীত, পৃষ্ঠা ৫৮)

সাধক-কবির মাকে পাওয়ার একমাত্র পথ ও পাথেয় হল গান—

গানে গানে লয়ে তানে
থাক মা জেগে আমার প্রাণে
লীন হয়ে যাই মা তোর নামে
কাজ কি মোর অন্য সাধনে।। (প্রাগুক্ত)

মা কখনো কারো একার হন না। তিনি সাধু-সজ্জন, অসাধু-দুর্জন সকলের মা, সে-কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ অনাবিল ভাষায় উচ্চারণ করেছেন—

সাধু সজ্জন-জননী তুমি মা
অসাধু দুর্জনও সুত তোমার
বহে নিরন্তর অন্তহীন ধার
তব অনন্ত করুণাধার।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬)

মিথ্যা যতই মোহন বেশ ধরে আসুক, আমরা যেন মায়ের চরণসেবায় অচল থাকি। কারণটি সাধক চণ্ডিকানন্দ আমাদের জানিয়েছেন—

তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ
তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান
তোমার তরে গেয়ে গান
যেন মোদের জীবন যায়।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬)

এবার ভোগ নয়, ত্যাগ। এবার ব্যষ্টি-চিন্তা নয়, সমষ্টির চিন্তা। আর জগৎপ্রপঞ্চে ডুবে থাকা নয়। শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্যময় হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা হবে—

ত্যাগের মন্ত্র দাও মা আমায়
তোমার কাজে প্রাণ যেন যায়
বদ্ধ যেন হই না মা আর
মায়ার এ সংসারে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭)

চণ্ডিকানন্দের ‘বিবেকানন্দ-লীলাগীতি’ (দুটি পর্ব ও পরিশিষ্টে দশটি ‘বিবেকানন্দ সঙ্গীত’, প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬২) তাঁর সারা জীবনব্যাপী সংগীতসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বহু ব্যক্তির অনুরুদ্ধতায় বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে সংগীতগুলি রচিত হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার শর্মা এই গ্রন্থের কথিকা অংশগুলি লিখে দেন। আবার নানা জনের রচিত সংগীত তিনি রিক্‌থতায় নিজের গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) রামকৃষ্ণের (১৮.২.১৮৩৬-১৬.৮.১৮৮৬) লীলা সংবরণের পর তাঁকে ‘জীবন-পথের ধ্রুবতারা’, ‘নয়নের মণি প্রাণের প্রাণ’ হিসেবে অনুধ্যান করতেন। বিবেকানন্দের সংকল্পের এই কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ ভাষা-সুরে সংগীতের আবহে রূপ ও বাণী দিয়েছেন—

নিজ সুখ-আশা দিব বিসর্জন
জীব-সেবা লাগি ধরিব জীবন
নরের মাঝারে পূজি’ নারায়ণ,

গেয়ে যাব মহামিলন গান।।

(বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ২৭)

আসল কথা, এ তো সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীর আত্মনিবেদন। বিবেকানন্দের সাধনাই ছিল জীবসেবা। নর-নারায়ণ জ্ঞানে সকলের মঙ্গল সাধন। বিবেকানন্দের এই গভীর বাণী চণ্ডিকানন্দ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে সংগীতের ভাষা উচ্চারিত হয়েছিল পরম পবিত্রতায়—

জীব-সেবা তরে সঁপিব নিজেরে যতদিন দেহে থাকিবে প্রাণ।
ভজন সাধন তনু-মন-প্রাণ নিঃশেষে সবই করিব দান।।
ইহপরকালে সুখের বাসনা
আপনার লাগি কিছু রাখিব না
যায় যদি দেহ তবু থামিব না
সাধিব সদাই জীব-কল্যাণ।।

(প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৪২)

সকল মানুষ তো ব্রহ্মস্বরূপ। তাহলে কেন বোধহীন জাতপাতের সংকীর্ণ ভেদাভেদ? তাই বিবেকানন্দের দৃপ্ত কণ্ঠের বাণী চণ্ডিকানন্দের গানে ভাষা পায়—

অত্যাচারী অভিজাত! তুমি আজ লীন হয়ে যাও।
উঠুক জাগিয়া আজি নতুন ভারত, তোমার যা আছে তারে দাও।।
চাষা জেলে মালা মুচি জাগুক এবার
ঝোড় জঙ্গল ভেদি', ভেদিয়া পাহাড়
'ওয়াহ্ গুরু কী ফতে' করি হুংকার
জাগুক নারায়ণ, পথ ছাড়ি দাও।।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি'র পরিশিষ্ট অংশের 'বিবেকানন্দ-সঙ্গীত' স্বামীজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তাঁর চরিত্রের স্বরূপটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়। যেমন—

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে আয় রে আয়।
আহ্বানে তাঁর আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়।।
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে
ভোগবাদ-জাত দানব দলিতে আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়।।
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভোগ-কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল
নিভোতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এসো দেব এসো করুণা-নিধান লহ আজি মম তনু মন প্রাণ
কৃপা করি কর এ আশিস দান তব কাজে যেন জীবন যায়।।

(বিবেকানন্দ-সঙ্গীত, সংখ্যা ২, পরিশিষ্ট বিভাগ, পৃষ্ঠা ১)

'বিবেকানন্দ-সঙ্গীত'-এর দশটি গানে 'বিবেকানন্দ বিবেকভাস্কর', 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'-এর জীবনকথা ও কর্মসাধনার সংগীতময় প্রতিবেদনে আমরা অনুশাসিত হই। যা-ই হোক, এ-পর্যন্ত গেল 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি'-র কথা। এবার 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি'-র গ্রন্থ-কথা।

'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গ্রন্থটিতে (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) মোট ২৩১টি সংগীত রয়েছে। এই সংগীতগুলি চারটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলি হল ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ১-২৭, সংগীতসংখ্যা ৫০), খ) শ্রীসারদা-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ২৮-৮০, সংগীতসংখ্যা ১১৬), গ) শ্রীবিবেকানন্দ-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ৮১-৯৬, সংগীতসংখ্যা ৩৮), ঘ. বিবিধ সঙ্গীত-স্বদেশ বন্দনা (পৃষ্ঠা ৯৬-১০৭, সংগীতসংখ্যা ২৫)। গ্রন্থারম্ভে দুটি সংগীত ('নমো কামারপুকুর জয়রামবাটী ধাম' ও 'কামারপুকুরে চল মন') আছে। এই গ্রন্থের কোনো কোনো সংগীত চণ্ডিকানন্দের অন্য সংগীত থেকে অনুবৃত্তি লাভ করেছে। এখানে ত্রিরত্নের প্রতি (সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) স্বামী চণ্ডিকানন্দের শ্রদ্ধাবনত চিত্তটি আমাদের বিনম্র করে। এঁদের মানবপ্রীতির কথায় আমরা আপ্লুত হই। ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছামন্ত্রটির ঋজু ভাষা ও ভাব আমাদের হৃদয়ের জারক রসে জারিত হয়ে অপার আনন্দ দেয়। চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন—

চাও যদি ভগবান
আগে আপনারে অপরের তরে নিঃশেষে কর দান।।
লভিতে শক্তি সাধ যদি হয়, লোকের সেবায় কর দেহ ক্ষয়,
পাইবে শান্তি হবে নির্ভয়, পূরিবে মানস-কাম।।

(শ্রীবিবেকানন্দ-সঙ্গীত, সংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা ৯২)

'বিবিধ সঙ্গীত-স্বদেশ বন্দনা'-র শেষ গানটি (২৫ সংখ্যক) আমাদের আন্তর্জাতিকতা বোধে উন্নীত করে। বিশ্বের প্রখ্যাত ধর্মগুরু, যাঁদের কালে কালে মর্তধামে আবির্ভাব জনগণের মধ্যে কল্যাণ-সংহতি-শান্তি এনেছিল, তাঁদের পবিত্র নাম ও কর্মকথা সংগীত-সাধক চণ্ডিকানন্দ শ্রদ্ধায় উক্ত সংগীতে উচ্চারণ করেছেন।

এই গানে ভবভয়হারী-ধর্মসমন্বয়কারী রামকৃষ্ণ, রাজধর্ম সংস্থাপক রামচন্দ্র, পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধার শ্রীকৃষ্ণ মুরারি, জীব উদ্ধারক-নির্বাণ প্রচারক বুদ্ধদেব, জ্ঞানমূর্তির প্রতিরূপ শংকরাচার্য, জীবহিতকারী রামানুজাচার্য, শুদ্ধা ভক্তির বিগ্রহ— অদ্বিজচণ্ডালপ্রেমিক গৌরহরি, শিখ ধর্ম সংস্থাপক শ্রীগুরু নানক ও চিন উদ্ধারক লাউৎজে কনফুসিয়াস সকলেই আছেন। এ-ছাড়া আছেন—

জীবে দয়া শিখাইলে যীশু রূপ ধরি'
মোহম্মদ মানব-সাম্য প্রবর্তনকারী।।
শ্রীবিবেকানন্দ জয় বেদান্ত-কেশরী,
নব যুগে সর্ব যোগ সংস্থাপনকারী।।

সবশেষে এই সাধকের আকুল প্রার্থনা—

যুগে যুগে যত ঋষি আসিলে ভুবনে
দয়া করে পদরেণু দাও অভাজনে।।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' একটি উল্লেখযোগ্য সংগীতগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে আছে— হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত ও ভীমকর্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খধ্বনি করেছিলেন। কৃষ্ণের শঙ্খের নাম হল পাঞ্চজন্য। সমুদ্রে বাসকারী পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করে তার অস্থিতে তিনি এই শঙ্খ নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র পাঞ্চজন্য শঙ্খের কথা মনে রেখে সাধক-সংগীতজ্ঞ এই গ্রন্থটির পাঞ্চজন্য নাম রেখেছিলেন। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় চণ্ডিকানন্দ পাঞ্চজন্যের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি গান রচনা করেছিলেন। এই গানের প্রথম দুটি চরণ হল—

পাঞ্চজন্য শোন, শোন সবে পাতি কান
আবার আসিল নামি', আসিল রে ভগবান।

এই কথার দ্যোতনা পাই স্বামী গম্ভীরানন্দের কথায়— "স্বামীজির মতে আধুনিক যুগে দরকার উচ্চ ভাবাত্মক, বীরত্ব ব্যঞ্জক সঙ্গীত—যার দ্বারা মোহ কাটে, জড়তা ছোটে, আর দিশেহারা মানব খুঁজে পায় জীবন-সঙ্গীতের মূল তান। কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতা শুনিয়ে প্রিয় সখা অর্জ্জুনের ক্লীবতা নাশ করেছিলেন; আর আজকে এই হতভাগ্য জাতিকে অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে দিব্যবাণী নিয়ে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

"কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের নাম ধারণ করে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার গানগুলি সেই দিব্য মাভৈঃ বাণীরই প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে আমাদের হৃদয়ে। সেই ভাব, সেই ভাষা, সেই তেজ, সেই আশাকে কবি রূপ দিয়েছেন সুরে-তালে-লয়ে-মানে। নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বামীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সময়োচিত ও সার্থক হয়েছে।" [ভূমিকা, পাঞ্চজন্য— বিবেক-গীতি, প্রথম প্রকাশক : স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ : বিবেকানন্দ শতবার্ষিক বর্ষ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৪৭+১ (বিজ্ঞাপন)]

স্বামী চণ্ডিকানন্দের এমন কোনো প্রাণপ্রদ বিষয় নেই যা তাঁর সুললিত সংগীত-প্রবাহে রূপ পরিগ্রহ করেনি। বলা বাহুল্য, রসোত্তীর্ণ এই পাঞ্চজন্য সংগীত-গ্রন্থখানি আমাদের দেশের সংগীত ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের পরম সম্পদ। এই পাঞ্চজন্য গ্রন্থের (তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০১১) সব কথাই পূর্ব আলোচনায় উঠে এসেছে। শুধু 'গুরুসঙ্গীত' নিয়ে সামান্য যেটুকু বলা চলে তা হল, এখানে চণ্ডিকানন্দের বিনয়াবনত রূপ আমাদেরও শ্রদ্ধায় মাথা নত করায়। এখানে মাত্র চারটি সংগীত সংকলিত হয়েছে। সব সংগীতের এক কথা এক সুর। পরমেশের কাছে 'বিষয়-বাসনা' থেকে তিনি মুক্তি চান। এখন তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা 'তোমাতে এ চিত কর নিমগন মিশে যাই চিরতরে।।' (পাঞ্চজন্য, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৮, সংগীত সংখ্যা ৩০২)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ গীতিকার ও সুরকার। তাঁর 'ভজন সঙ্গীত' (স্বরলিপি) সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি সহজ ভাষায়, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের জীবন-সংগীত রচনা করেছেন। সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় সংগীতগুলির সময়োপযোগী সুরও নির্দেশ করে দিয়েছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "'সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা' সঙ্গীত গ্রন্থটি রচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে একান্ত পরিচিত এবং সঙ্গীতজ্ঞানী স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ। তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ অনেকগুলি আছে, তাদের মধ্যে 'পাঞ্চজন্য' ২য় সংস্করণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য—এতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি আত্মজ্ঞান বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীত সমূহের অন্তর্নিবেশ আছে। তাহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থের

চিরবরেণ্য শ্রীম বা মহেন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশ্যেও একটি সঙ্গীত আছে। এ ধরনের ভক্তি-সঙ্গীতগ্রন্থের একান্ত অভাব। সঙ্গীতজ্ঞানী স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ সেই অভাব পূর্ণ করেছেন, এজন্য তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।" (ভজন সঙ্গীত-স্বরলিপি-সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত, তারিখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, স্থান কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) এরপর এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের রচিত সাবলীল গানগুলি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। সাঁওতাল, খাসি, নাগা, মিজো, মিকির, মিরি, রাজবংশী, মণিপুরি, নেপালি প্রভৃতি পর্বতবাসীর কাছেও তিনি সমাদর লাভ করেছিলেন। ভারতের বাইরেও তাঁর রচিত গানগুলি প্রশংসা অর্জন করেছিল।

কিন্তু বাঙালি বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। স্বামী চণ্ডিকানন্দকে আমরা মনে রাখিনি। তাঁর কর্মকাণ্ড ও সংগীতসাধনার বিষয়টি তো অনেক দূরের কথা। আত্মবোধে বিষয়ী ও বিষয়কে গ্রহণ করা আমাদের স্বভাবে নেই। হেতু যখন মুরুব্বি হয়ে বুদ্ধিকে গ্রাস করে তখনই আমরা আলোচনায় তন্নিষ্ঠ হই। তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯.৯.১৯০৩-২৯.১.১৯৭৬) কথাকে নিজের মতো করে নিয়ে স্বামী চণ্ডিকানন্দ সম্পর্কে বলতে পারি— দেশলাই জ্বেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পুজোর প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এই লেখা শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পুজো, দীপ-জ্বালানো আরতি। ❑

আসামে বিবেকানন্দ

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য

[‘সাহিত্য’ পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য যখন ঁরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র কয়েকখানি পাঠাই, তখন ঁসুরেশ সমাজপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, ঈদৃশ আরো চিঠিপত্র আছে কি না? উত্তরে লিখি, যে-সকল চিঠি আছে, তাহার লেখকগণ সৌভাগ্যক্রমে জীবিত— তবে ঁস্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি (বর্তমান গুয়াহাটি) আসিলে তাঁহার সঙ্গে যে-সকল আলাপ আলোচনা হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থে পাঠাইতে পারি— কিন্তু সে-সব স্বর্গীয় স্বামীজির তেমন গৌরবজনক না-হইবার কথা— বিশেষত আমি তাঁহার ‘ভক্ত’ও নহি। ইহার উত্তরে সুরেশবাবু লিখিয়াছিলেন, ‘... আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। সে যাহা হউক প্রবন্ধটি পাঠাইবেন। পাঠান্তে আমার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইব। ... প্রবন্ধ ‘সাহিত্যে’ প্রেরিত হইল; কিন্তু হায় সুরেশবাবুর অভিপ্রায় হইতে ইহা বঞ্চিত হইল।— লেখক]

আজ (১৩২৭) ঠিক ২০ বৎসর হইল, স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে সদলবলে আগমন করেন; এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ঁকামাখ্যা দর্শনান্তে শিলং যান এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ দু-একদিন এখানে থাকেন। তখন গৌহাটিতে সেনসাস অফিস ছিল— সেই অফিসে কাজ করিতাম। তাই বিবেকানন্দের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল— শিলং যাওয়া-আসা উভয় কালেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ এবং দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন— তাঁহার জননীও নাকি ঁকামাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি সুবৃহৎ ‘বাংলো’ ঘর দেওয়া হয়— এবং গৌহাটিস্থ সর্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।

বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব দিবস অপরাহ্ণে জনৈক ভদ্রলোক সহ আমি ওই বাংলো ঘরে যাই। বারান্দায় একখানি টুলের উপর একটি গৌরবর্ণ ‘গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা’ লোক একাকী বসিয়া আছেন— চুলগুলি এলোমেলো, পান চিবাইয়া ঠোঁট লাল হইয়াছে; দেখিয়া মনে করিলাম, ইনি বোধ হয় স্বামীজির কোনো ‘চেলা’ হইবেন। ইহার পূর্বে স্বামীজির ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় বড় দুইটি চোখ ছাড়া এই মূর্তির সঙ্গে, ছবি দেখিয়া যে-মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কোনো সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই। (এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। যতদূর স্মরণ হয়, স্বামীজির কপালে একটা দাগ— কাটার চিহ্ন— যেন দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার ছবিতে এরূপ কোনো দাগ দেখা যায় না। তাঁহার জীবনচরিতেও এই দাগের কথা আছে (স্বামী বিবেকানন্দ— শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু কৃত ২৮ পৃষ্ঠা)। তবে ছবিতে দাগটা থাকা কি ভক্তগণের অনভিপ্রেত বলিয়াই ইহা নাই? চরিতাখ্যানেও কি এরূপ হস্তাবলেপ ঘটিয়াছে?) সে যাহা হউক, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম— ‘স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি— দেখা হইবে কি?’ ইনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন— ‘তা, আপনাদের কী কথা আছে

বলুন।' (এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, এতদিন পরে স্মরণ করিয়া লেখাতে অনেক কথাই লিখিতে পারা গেল না— যাহা লিখিত হইল, তাহাতেও ঠিক এইরূপ ভাষাতেই উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, এ-কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। তবে 'মর্ম' এইরূপই ছিল, এটুকু বলিতে পারি। দিন-তারিখ হুবহু ঠিক না-হইতে পারে, কেননা আমার কোনো 'ডায়েরি' নাই।) তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্গী ভদ্রলোকটি আমার পরিচয় দিলেন। তখন নানা রূপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় উঠিল— আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা। স্বামীজি বলিলেন, "বৌদ্ধ-যুগের পূর্বে এদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম, "কেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে কত উৎকৃষ্ট সৌধ প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।" তিনি বলিলেন— "ও সব অত্যুক্তিপরিপূর্ণ বর্ণনা।" তার পর প্রসঙ্গত বলিলেন— "এই যে আপনার গলায় পইতা, এটাও পারসিকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম, "সে কী, উপবীত শোধনের যে বেদমন্ত্র আছে— তাতে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দটিও তো স্পষ্ট রহিয়াছে।" তিনি বলিলেন— "আচ্ছা, ওই মন্ত্রটা পড়ুন তো?" পড়িলাম, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" ইত্যাদি। তখন বলিলেন, "দেখুন, এ-মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত; ইহার শব্দ ও ছন্দ আধুনিক।" আমি একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলাম— "তা হলে স্বামীজি, আপনাতে আর দয়ানন্দে (পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যসমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) কোনো প্রভেদ দেখিতেছি না; এরূপ অবস্থায় কোনো তর্ক চলিতে পরে না।" ফলত ওই রূপ আলোচনার ওইখানেই বাধা পড়িল— আর কোনো রূপ 'তর্ক বিতর্ক' তাঁহার সঙ্গে আমার হয় নাই।

অতঃপর আরও কিছুকাল কথাবার্তা হইল— অবশেষে জানা গেল স্বামীজি পরদিন সংক্রান্তিতে (খুব সম্ভব) কামাখ্যা দর্শন করিবেন এবং তৎপরদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবেন।

সঙ্গী ভদ্রলোকটির সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া নির্দিষ্ট দিনে বশিষ্ঠাশ্রমে গেলাম। আশা ছিল, স্বামীজি সদলবলে সেখানে যাইবেন— তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইবার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল— কোনো কারণে তিনি সেদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন নাই। ক্ষুণ্ণমনে শহরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, স্বামীজির বক্তৃতা হইতেছে। দ্রুতগতিতে বক্তৃতার জায়গায় গিয়া দেখি, লোকারণ্য, এই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হওয়া তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম ইতঃপূর্বে সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) ধীরেশ্বরাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে নাকি স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল; সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি যখন গিয়া জনতার পশ্চাদ্ভাগে কথমপি দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম, তখন সভা নিস্তব্ধ— স্বামীজি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিবেন না, বসিয়াই দু'চারি কথা বলিবেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "একটা প্রসঙ্গ তুলুন— কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, তদবলম্বনে কিছু বলিতে পারি।" কিন্তু সমবেত জনগণের মধ্যে কেহই অগ্রসর হইয়া কোনো প্রশ্ন করিতেছেন না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই ভট্‌চার্জি কোথায়?" একজন, "ভট্‌চার্জি"-র সঙ্গে স্বামীজির সেই দিনের তর্কবিতর্কের কথা বোধহয় শুনিয়াছিলেন, তাই, বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলেন— "উনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন।" তখন কিন্তু খোদ "ভট্‌চার্জি" জনতার অন্তরালে— সাড়া দিবার অবস্থায় না-থাকাতে চুপ করিয়াই রহিয়াছিলেন। সে যাহা হউক— এই প্রশ্নোত্তরে সভার নীরবতা ভঙ্গ হইল— তাই অপর একজন ওই সময়ে বলিলেন,— "জাতি-বিচার উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলুন।"

তদুত্তরে স্বামীজি যাহা বলিলেন, তাহাতে জাতিভেদের উপকারিতা প্রথমত প্রদর্শন করিলেন; অবশেষে ইহার সঙ্গে যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার জড়িত রহিয়াছে, তদ্‌বিরুদ্ধে বহু বলিলেন। সেই সময়েই দুইটি কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনি; (১) 'হাঁড়িধর্ম', (২) 'ছুঁতমার্গ'। তখন, "খুলিল বাক্যের দ্বার না লাগে কপাট"— 'জাতিবিচার' ছাড়িয়া নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। এই জাতিটা একটা জড় পদার্থ, সেই মনুর সময় হইতে একই ভাবে চলিয়াছে— 'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বত্মনঃ পরম্। ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাঃ'— এটা কি ভালো? এইরূপ জড়তায় দেশ উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে— বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কিছু করো— না-হয় বড় দরের একটা চুরি ডাকাতি করো— তবুও বুদ্ধি খুলুক, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা বলিলেন। তাঁহার সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার পূর্ব ধারণা বহুল পরিবর্তিত হইয়া যায়; তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতা অথবা অপর যে-সকল বক্তৃতা পড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, ইনি একজন বেদান্তবাদী ধর্মপ্রচারক। কিন্তু ওই দিনকার বক্তৃতায় বুঝিলাম

যে, ধর্মপ্রচার একটা 'খোলস' মাত্র— ভিতরে স্বতন্ত্র ভাব। জাতিটা তাঁহার মতে নিদ্রিত— এটা জাগিয়া উঠুক— উঠিয়া একটা নাড়া-চাড়া দিউক; খাদ্যাখাদ্য বিচার ইত্যাদিতে তাঁহার মতে সমগ্র জাতিকে সঙঘবদ্ধ হইতে দিতেছে না, সেটা উঠিয়া যাউক, ইত্যাদি। প্রকৃত ধর্মবক্তা জাতিটার উপর একটা মোহের আবরণ দেখিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন বটে— কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা আছে, তাহা দূর করিয়া দাও, "না হয় একটা বড় দরের চুরি ডাকাতি করিয়া বুদ্ধি খোলো" এইরূপ উপদেশ কখনো দেন না।

অতঃপর স্বামীজির শিলং যাত্রার পূর্বে আবার দুই দিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরেজিতে নিয়মমতো বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয় নির্দেশপূর্বক প্রদত্ত হয়। প্রথম দিন জনৈক বাঙালি প্রবীণ উকিল সভাপতি হন— অপর দিন আসাম ভ্যালি ডিভিশনের কমিশনার মি. এ. পোর্টিয়াস বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। একদিন বিষয় ছিল 'Transmigration of the Soul' এটা খুবই স্মরণ আছে; কিন্তু অপর দিনের বক্তৃতার বিষয়টি ঠিক স্মরণ নাই; তাহাতে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্য ছিল, ইহা দ্বারা অনুমান হয়— 'Vedanta in Indian Life' এইরূপ একটা বিষয় ছিল। (এই অনুমানের একটা কারণ আছে। স্বামীজির বক্তৃতা লইয়া উকিলদের বৈঠকখানায় আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে নাকি কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "বক্তৃতায় নূতন কিছুই নাই— পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে— মুখস্থ শক্তি খুব অদ্ভুতই বটে।" মাদ্রাজের নটেশান প্রকাশিত স্বামীজির বক্তৃতাবলির ওই বিষয়ক বক্তৃতাতেই 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকের উল্লেখ ও তরজমা আছে।)

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কী সুমিষ্ট আওয়াজ, কী সুন্দর আবৃত্তি— কী সুষ্ঠু শব্দযোজনা। বিশেষত প্রথম দিন যাঁহাকে দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই— তাঁহার সেই পাগড়ি, সেই আলখেল্লা দেখিয়া মনে হইল, "হাঁ ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ— যাঁর ছবি পূর্বে দেখিয়াছি।" তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয়, সস্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল (শুনিয়াছি, চেহারার চাক্‌চিক্য বিধানার্থ নাকি স্বামীজি গ্লিসেরিন ব্যবহার করিতেন।) এও এক দেখিবার জিনিস। ফলত আজ বিশ বৎসর পরেও যেন সেই মূর্তি চোখে ভাসিতেছে— সেই কণ্ঠস্বর কানে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিকা খেপিয়াছিল?

এই দুই বক্তৃতার দিন অনেক সাহেব বিবি সভাস্থ হইয়া স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালির দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজি শিলং চলিয়া যান। (স্বামীজির শিলং যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আমিও সেনসাসের কাজে শিলং গিয়াছিলাম— এবং তত্রত্য বন্ধুবর্গের প্রমুখাৎ তাঁহার কাহিনি শুনিয়াছিলাম— তাই যথাশ্রুত দু'একটি কথা লিখিতে পারিলাম।) সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভ্যর্থনার জন্য বাঙালি ভদ্রলোকগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন। সেখানে একদিন মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত হইয়া পড়াতে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই, বৈঠকি আলোচনা অবশ্যই হইয়াছিল। লোকপ্রিয় শাসনকর্তা (স্যার) হেনরি কটন চিফ কমিশনার ছিলেন। তিনি স্বামীজির খুব তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলে, স্বামীজি বক্তৃতারম্ভে বলিলেন;— "তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীদের কর্তব্য, তাই কামাখ্যা হইয়া শিলঙে আসিয়াছি। এস্থানেও হেনরি কটনের ন্যায় সাধু পুরুষ রহিয়াছেন— তাই ইহাও একটি তীর্থ— তীর্থীকুর্বন্তি সাধবঃ" ইত্যাদি। শিলং শহরে পাঁঠা খুব শস্তা, আহার্য বস্তুর মধ্যে মাংসসম্ভারই সমধিক থাকিত— একদিন তাহাতে কিছু ত্রুটি ঘটাতে সঙ্গীরা নাকি ক্রোধ প্রকাশও করিয়াছিলেন। শিলং হইতে ফিরিবার কালে বোতলে বোতলে "সুরুয়া" পাথেয়স্বরূপ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কারণে, বিশেষত জনৈক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবমতাবলম্বী ভদ্রলোকের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি একটা অশ্লীল কথা বলাতে, (সেই ভদ্রলোকটি এ-বিষয়ে যাহা (সম্প্রতি) লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :— "... কথা প্রসঙ্গে স্বামীজি 'নামরূপ মিথ্যা' বলিয়া উঠিলেন। আমি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি তাহাই হয় তবে, 'নিত্যলীলার' অর্থ কি?" এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ নিত্যলিঙ্গ আর ঐ নিত্যযোনি কি, তাহা আমি জানি না।' বলা বাহুল্য, ঐ বিষম কটূক্তি শুনিয়া আমি ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ... দাদা প্রভৃতি অনেকেই মর্মাহত হইলেন। ...উত্তর দিবার জন্য যখন আমি উদ্যত, তখন দাদা আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় গেলেন।...") শিলঙে অনেকেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নদীয়া ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামীবংশীয় জনৈক অত্যুচ্চপদস্থ কর্মচারী বিবেকানন্দ

অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্ত হইয়া একদিন নাকি উপবাসও করিয়াছিলেন।

শিলং হইতে ফিরিয়া স্বামীজি গৌহাটিতে দুই চারিদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ করিয়াছিলাম। একটি 'রুমে' তিনি ও আমি নির্জনে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলাম— তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িক ভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি, শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে— এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপর অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কী?" তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন— "ভট্‌চার্জ মহাশয়, বলব, বলব।" আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই— কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম— তাহা (যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন) এস্থলেও না-বলাই সংগত।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার আমেরিকার কাজের বিষয় উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন— "সেখানে এমন করিয়া আসিয়াছি যে, এখন যে-কেহ গিয়া ক'রেকর্মায়ে বেশ থাকতে পারবে, 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব'।" থিয়সফিস্টদের কথা উঠিল, আমি একটু প্রশংসাই করিলাম— "এঁরা সেই আমাদেরই শাস্ত্রের বহু কথা প্রচার করিতেছেন।" উত্তরে স্বামীজি যেন একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলেন,— "সাহেবেরা আমাদের উপরে সব বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতেছে, আবার ধর্মবিষয়েও আসিয়া গুরুগিরি করিবে, এটা আমি সহিতে পারি না। (এই কথাটি আমার কাছে বড়ই ভালো লাগিয়াছিল— ১৯১১ অব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মেলনে যখন শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কয়েকদিন অবস্থান করি, তখন একদিন তাঁহার কাছে এ-বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, এবং 'বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়াছেন' এরূপও বলিয়াছিলাম। হীরেন্দ্রবাবু স্বয়ং থিয়সফিস্ট দলের একজন নেতৃস্বরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন— "সাহেবের গুরু হইবে কেন? তাঁহাদেরও তো নেতা আমাদেরই 'মহাত্মাগণ'।" আমি বলিলাম, "মহাত্মারা এদেশে কি লোক পাইলেন না যে, অলকট্ ব্লাভাট্স্কির স্কন্ধে ভর করিলেন?" উত্তরে বোধ হয় তিনি এই বলিয়াছিলেন— "সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী কাজ করিবার সমর্থ লোক আমাদের দেশে কোথায়? এঁদের দ্বারা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্র জগতে তত্ত্ববিদ্যার প্রচার হইতেছে। আমাদের দেশের অনেকেও এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আধিক্যবশত উপকৃত হইতেছেন।") আমার জীবনের এক উদ্দেশ্য ছিল— বেদান্ত দ্বারা ওদের জয় করা। বহু সাহেব বিবি দ্বারা পা টেপাইয়াছি।" কথায় কথায় তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতার সম্বন্ধে আলাপ হইল। বলিলাম "স্বামীজি, আপনার গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস তো প্রতিমা অর্চনা করিয়াই চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি তাহলে চিকাগো বক্তৃতায় কীরূপে এ-কথা বলিলেন, 'From high soaring flights of Vedanta philosophy to vulgar ideal of idolatry!' মূর্তি পূজাটা কি 'Vulgar'?" স্বামীজি বলিলেন, "আমি কি 'Vulgar' বলিয়াছিলাম?" আমি বলিলাম, আমার তো যেন তা-ই মনে হয়।" তিনি বলিলেন "তা হলে 'Vulgus=people, Vulgar' অর্থ 'popular' এই আমি 'মিন' করিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম "তাহলে 'Vulgar' না-বলিয়া সোজাসুজি 'popular' বলিলেই তো পারিতেন?" অতঃপর এ-বিষয়ে আর কথা চলে নাই। (সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে হইল যে, আমার স্মৃত্যনুসারেই আমি তাঁহার বক্তৃতার ওই বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইদানীং প্রকাশিত তাঁহার ওই বক্তৃতায় কথাটি এভাবে আছে "From the high spiritual flights of Vedantic Philosophy...to the low ideas of idolatry." শব্দটা 'low' আছে 'vulgar' নহে। এই 'low'টা স্বামীজি কীরূপে বুঝাইতেন জানি না।)

আরও বহু কথা হইল— সব স্মরণও নাই— দু-একটা কথা (উপরে উল্লেখিত ছাড়া) মনে আছে তাহা নানা কারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে পূর্বের বৈঠকি বক্তৃতা শুনিয়া যে-ধারণা হইয়াছিল, এই আলাপের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষচর্মাচ্ছাদিত একটি কেশরী!

আলাপাবসানে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি 'ফ্রেঞ্চ নভেল' দু-একখানি পাঠাইয়া দিতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; তদর্থে কমিশনার পোর্টিয়স্ সাহেবের নিকটে চিঠি দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা পাঠাইয়াছিলেন কি না ইত্যাদির খবর আর নেই নাই। একজন সন্ন্যাসীর 'ফ্রেঞ্চ নভেল' পাঠের স্পৃহাটা আমার কাছে তত ভালো ঠেকে নাই।

আসামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিভ্রমণস্মৃতি আমাদের পক্ষ হইতে বিবৃত করা হইল। ওই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের স্মৃতিও এ-স্থলে আলোচনাযোগ্য মনে করিতেছি।

বেলুড় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের গল্প

করিয়াছিলেন। ... কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন— "এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুন্‌লুম। তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুন্‌লুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব আর শঙ্করাচার্য একই লোক কিনা বুঝিতে পারিলাম না। তবে লোকগুলিকে দেখিয়া বোধ হইল ত্যাগী— সম্ভবত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ।" (শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড', ১০২৪—২৫ পৃষ্ঠা।)

যাঁহারা জ্ঞাতসার, তাঁহারা এইটুকু পড়িয়া স্বামীজির গবেষণার প্রসার দর্শনে স্তম্ভিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক মহাত্মা শংকর দেবের নামটি 'হঙ্কর' দেব এই তুচ্ছভাবে উল্লেখ করা কতদূর সমীচীন, তাহাও বিবেচ্য। কোথায় কায়স্থ বৈষ্ণব গৃহস্থ শংকরদেব, আর কোথায় ব্রাহ্মণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শংকরাচার্য। জানি না তিনি কার কাছে শংকরদেবের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং কাহাদের দেখিয়া 'ত্যাগী' বোধ করিয়াছিলেন। ফলত ইহা বড়ই আশ্চর্যের এবং আক্ষেপের বিষয় যে, ধর্মপ্রচারক বলিয়া বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ আসাম অঞ্চলের এই সুবিখ্যাত ধর্মপ্রচারকের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকল্পে কোনো প্রযত্ন করেন নাই; তাহা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে তাঁহারই জাতীয় একজন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এই কামরূপ অঞ্চলে কী এক প্রবল ধর্মান্দোলন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ বঙ্গদেশে আপামর সাধারণের হিতার্থে হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এই মহাত্মাও তাদৃশ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পার্বত্য জাতীয়েরাও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া হিন্দুধর্মের গণ্ডির ভিতরে আসিতেছে— আসামি ভাষা তাঁহারই স্বরচিত কীর্তন ভাওনা (নাটক) প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। ❑

[*রচনাটি পদ্মনাথের পৌত্র শ্রী শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য দ্বারা কলকাতা থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। শক্তিপ্রসাদের অনুমতিক্রমে এটি এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হল মূল রচনা অবিকৃত রেখে। তবে পুরনো বানান পরিবর্তিত।*— সম্পাদক]

মহাচিন

রামনাথ বিশ্বাস

১৯৩১ সনের জুলাই মাসের সাত তারিখ। কপর্দকহীন নিঃসহায় আমি একখানি মাত্র সাইকেল ও কয়েকখানা জামাকাপড় নিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। এবারকার যাত্রা আদিযুগের মানব-সভ্যতার প্রতীক মহাচিনের দিকে।

শ্যাম দেশের শ্যামল মাটি ছাড়িয়ে, মালয়ের ধুলা উড়িয়ে, ইন্দোচিনের বুক পেরিয়ে নবজাগ্রত মহাচিনের দ্বারে এসে যখন প্রণতি জানালাম তখন স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রজাল আমার মনে অনেকখানি রং ধরিয়ে দিয়েছে।

তংকিন প্রদেশের সমুদ্র-বন্দর হাইফং হতে ইউনান ফোঁ হয়ে সাংহাই যাবার বাসনা ছিল, কিন্তু তা হল না। কারণ এই অঞ্চলে পাহাড়ে রাস্তা। তদুপরি এসব রাস্তা আবার দস্যু ও 'কমিউনিস্টে' ছেয়ে গেছে। সেদিকে যে-ই যায় তাকেই তারা নাকি হত্যা করে ফেলে। অনেকে উপযাচক হয়ে বলেন, এমন খারাপ রাস্তায় যেন না যাই, গেলে মৃত্যু অনিবার্য। আমার মনে কিন্তু তাতে আঁচড়ও লাগে নাই। তবে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যখন ওই পথে যাওয়ায় বাধা দিল তখন বাধ্য হয়েই ওই পথ পরিত্যাগ করা স্থির করলাম। আমি পথিক, পথের নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। সাপ, বাঘ, ডাকাতের হাতে মরতে রাজি আছি, তবুও নিষ্ক্রিয়তার আওতায় পচে মরতে কোনো দিন চাই নাই। ঠিক করলাম হাইফং হতে জাহাতে হংকং যাব। সেখান থেকে ক্যান্টনে গিয়ে ভাগ্যের উপর সব চাপিয়ে এগিয়ে চলব।

সমস্যা হল, এখন জাহাজ-ভাড়ার টাকা কোথায় পাই। এসব উপকূলবাহী জাহাজপথের ভাড়া খুবই বেশি। শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচিনে চিনা ধনীদের সাহায্য কম লই নাই। এদের ক্রমাগত জ্বালাতন করতে ইচ্ছে হল না। তাই এক ফরাসি জাহাজ কোম্পানির ম্যানেজারের শরণাপন্ন হলাম। সাহেব শুনেই উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, ভবঘুরেদের সাহায্য তিনি করবেন না। কাজেই তাঁর সময়ের অপব্যবহার না ঘটিয়ে আমায় সরাসরি পথ দেখতে বলে দিলেন। চলে এলাম, মনে একটুও দুঃখ হল না। এক চিনা কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখা করতে গেলাম। তিনি আমার নিবেদন অল্প একটু শুনেই বেশি বাক্যব্যয় না করে একখানা সেকেন্ড ক্লাস পাশ দিয়ে দিলেন।

ইন্দোচিনে আমার দিনগুলি কেটেছিল ভালোই। তাদের আতিথেয়তা, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমায় কম আনন্দ দেয় নাই। শারীরিক ও মানসিক নিরানন্দ কোনো প্রকারেই আমাকে স্পর্শ করবার সুবিধা পায় নাই। বন্ধুবান্ধব অনেকেই জুটেছিল। তারা আমাকে সর্বদা ও সর্বথা সুখে শান্তিতে রাখবারই প্রয়াস পেত। ১৯৩১-এর ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ইন্দোচিনের ফরাসি সরকারের গোয়েন্দারা বরাবরই আমার চলাফেরার উপর লক্ষ্য রেখেছিল। তাই বোধ হয় বিদায়বেলায়ও আমার সঙ্গে সঙ্গে একজন জাহাজে এসেছিল এবং জাহাজ না ছাড়া অবধি উপস্থিত ছিল।

আয়তনের বিশালতা, লোকসংখ্যার বিপুলতা ও ঐতিহ্যে চিনকে দেশ না বলে মহাদেশ বলাই সংগত। দীর্ঘদিন ধরে আমি মহাচিনের হাংকো, নান্‌কিন, সাংহাই, পিকিন প্রভৃতি মহানগরীগুলির বিভিন্ন অংশে যেমন ঘুরে বেড়িয়েছি তেমনি মাসের পর মাস চিনের দরিদ্র-পল্লির পথে প্রান্তরেও আমার দিন কেটেছে। সময় সময় যেমন চিনের বিখ্যাত বোম্বেটেদের হাতে পড়ে অত্যাচারিত হয়েছি তেমনি আবার সরল গৃহস্থদের মধুর ব্যবহার ও চিনা মা-বোনদের আন্তরিক স্নেহ ও সেবা সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়েছি।

চিনেরা সাধারণত বিদেশীদের বড় একটা সুনজরে দেখতে চায় না। এজন্য তাদের দোষ দেওয়া চলে না; কারণ চিনের

বুকে বসে তার শুভানুধ্যায়ী সেজে নানাদেশের লোক অনবরত তাদের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে। সময় সময় আমাকেও সন্দেহভাজন হয়ে নিগৃহীত হতে হয়েছে। পরে আবার অনুতপ্ত চিনাদের ব্যবহারে সব ভুলে গেছি।

আমি প্রথমে হংকং যাই। পরের দিন প্রাতে সাইকেল নিয়ে নগরী দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে সব পুলিশই পাঞ্জাবি, কেবল মাঝে মাঝে দু-একটি চিনা দারোগা টহল দিচ্ছে মাত্র। সমুদ্রের ধারের বাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট পথে এসেই দেখি একটি চিনা যুবতী পথে পড়ে আছে। তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, তা ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে। চিনারা দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছে, কেউ কাছে আসছে না। পাঞ্জাবি পুলিশ তখনও আসে নাই। ভাবলাম ডেকে নিয়ে আসি, কিন্তু এরই মধ্যে তিনজন পাঞ্জাবি পুলিশ এসে হাজির হল এবং লাশটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করল।

একজন পাঞ্জাবি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, পাছে ঘাড়ে ভূত চাপে বা সুইয়া অর্থাৎ দুর্ভাগ্য তাদের পেয়ে বসে এই ভয়ে চিনারা মৃত বা মৃতপ্রায় লোকের বিশেষ আত্মীয় না হলে কাছে ঘেঁষে না। চিনা দোকানে চা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ মিলে না। অনেক খোঁজ করে বোম্বাইয়ের একজন বোরা মুসলমানের দোকানে উঠলাম। দোকানি বড়ই অমায়িক লোক। তিনি চা, দুধ এবং তৎসহ কিছু পিঠা খাওয়ালেন, পয়সা কিন্তু নিলেন না। হংকঙের ভারতীয়দের কাছে আমার আসার সংবাদ প্রচারও তিনি করে দিলেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। এখানে একটি গুরুদ্বার আছে। তথায় ভারতীয়দের বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে দেওয়া হয়। অনেকে কাজের সন্ধানে এখানে এসে অনেকদিন কাটিয়ে দেয়। আর একটি জিনিস বিশেষরূপেই লক্ষ্য করবার আছে যে হংকঙে হিন্দু-মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে সত্যই এক অভূতপূর্ব আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য বিরাজমান। সেখানে হিন্দুস্থানের লোকমাত্রেই হিন্দু নামে পরিচিত।

বিকালবেলায় বাজার দেখতে গেলাম, সুবিধা হলে কিছু ফল কিনবার ইচ্ছাটাও ছিল। সেখানে ঝুড়ি ঝুড়ি সাপ বিক্রয়ার্থ আমদানি হতে দেখলাম। চিনারা সাধারণত বাজার থেকে সাপ কিনে বাড়ি নিয়ে যায়। প্রথমে তারা ফুটন্ত গরম জলে সাপটিকে ডুবিয়ে দেয়। তারপর তার মাথাটির চারিদিক ধীরে কেটে মাথা হতে লেজ পর্যন্ত সাপের বিষাক্ত শিরাটি অটুট অবস্থায় বের করে ফেলে। শিরাটি কোনো প্রকারে ফেটে বিষাক্ত রক্ত বেরিয়ে পড়লে সাপটি আর খাওয়া হয় না— ফেলেই দিতে হয়। অবশ্য ঢোঁড়াসাপের বেলায় এ-কথা খাটে না, তার মাথাটা শুধু কেটে ফেলা হয়। সাপের মাংস এদের এক উপাদেয় খাদ্য। বাজার থেকে সিঙ্গাপুরি আনারস ও কলা কিনে হোটেলে ফিরলাম।

এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। সাইকেলে চিন পরিভ্রমণের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। পথঘাটের বিপদাপদের নানা প্রকার কাহিনি উল্লেখ করে তিনি বারবার আমায় চিনভ্রমণে যেতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন আমার অগ্রসর হওয়ার বাসনা প্রবল, তখন শেষ খাওয়ার মতো তাঁর স্ত্রীর হাতের বাঙালি রান্না খাইয়ে দিলেন। আর জীবন্ত ফিরব না মনে করে উদ্‌বেগও কম দেখালেন না।

হংকঙে অনেকগুলি সিনেমা আছে। তাদের প্রেক্ষাগৃহ কলকাতার তুলনায় ভালো বলা যেতে পারে। কয়েকটি সিনেমা হাউসের মালিক ছিল একই কোম্পানি। তার এক ইংরেজ ডিরেক্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি চট্টগ্রামে অনেকদিন কাটিয়ে এসেছেন! বাঙালিদের বেশ একটু ভালোবাসেন বলে মনে হল। তিনি পরিচয়ের সূচনায়ই জিজ্ঞাসা করে বসলেন,— "আপনি ভূ-পর্যটন প্রয়াসী? কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়ে এলেন, আর চিনেই বা কেন বেড়াতে চান?" চিনদেশ দেখবার ও তার সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের কথা শুনে তিনি আমায় নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। চিনা মুল্লুকে ঢুকলে আর ফিরে আসতে পারব না এরূপ তিনি বললেন। এ ছাড়া পথে ঘাটে অসম্ভব অত্যাচার ও নির্যাতনের দুচারটা গল্প না যে শুনালেন তা নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সব সিনেমায় আমাকে একখানা ফ্রি কার্ড দিলেন।

এদিকে তিন দিনে হাতের সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আনুষঙ্গিক খরচের চিন্তায় একটু বিব্রত হতে হল। পরের দিন সকালে এক সিন্ধি রেশম ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করলাম। হংকঙে কতদিন কাটিয়ে তারপর অন্য দিকে বের হব তা জেনে নিয়ে তিনি কী একটা হিসাব কষে বললেন,— "দেখুন, চিনদেশে যখন যাচ্ছেন তখন ফিরে আসার উপায় নাই জেনে রাখুন, তাই আপনার বেশি টাকার দরকার পড়বে না। কোয়ান্টাং প্রদেশে অনেকটা শান্তি স্থাপন হয়েছে। সে দেশে যাতে আপনার অর্থাভাব না ঘটে তার ব্যবস্থা আমরা করে দিব। আপনাকে এক মাসের পাথেয় দেওয়া হবে। তারপর সবই আপনার ভাগ্য। বোধহয় বেশি দূর আর যেতে হবে না।"

হংকঙে দিন পনেরো কাটিয়ে প্রাণের সুখ ও শান্তির একটা শেষ কিনারা করে তবে তিনি যেতে উপদেশ দিলেন। হাতখরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে বাকি টাকা যথারীতি পাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

হংকং থেকে একদিন মাকাও বন্দর গেলাম। মাকাও হল হংকং ও নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রমোদ বিহারের একটি আড্ডা। আশপাশ থেকে বহু লোক আমোদ-প্রমোদের জন্য এখানে বেড়াতে আসে। অলিতে গলিতে, পথেঘাটে কেবল হোটেল ও নাচঘর— চারিদিকেই বিলাসের ছড়াছড়ি। শহরটির অনেক স্থলই মদ্যালয় এবং চণ্ডুখানায় ভরতি। যুবক ও ধনীর দল নানা প্রকার বিলাসে ও 'মাজাং' খেলায় অকাতরে তাদের অর্থ, সামর্থ্য ও সময়ের অপব্যয় করে দেশপ্রেমিক সান ইয়াৎ সেনের জন্মস্থানের নিকটে কী ভীষণ নরককুণ্ড সৃষ্টি করে ফেলেছে! আর পর্তুগিজ সরকার তাদের রাজস্ব সানন্দে আদায় করে অফুরন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা বিলিয়ে যাচ্ছে। শহরে বেড়িয়ে এসব দেখেশুনে মাথা ও মেজাজ দুই-ই বোধ হয় গরম হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের এক কল খুলে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে খানিকটা জল পান করলাম। আর বেড়িয়ে দেখার প্রবৃত্তি হল না। এক ডলার দক্ষিণা দিয়ে এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম। হোটেলের পার্শ্ববর্তী একজন ক্যান্টনি যুবকের মিঠাইয়ের দোকান থেকে কিছু ভারতীয় গজা কিনে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। বিদেশে বসে দেশী খাদ্য খাওয়ায় কতই না আনন্দ!

প্রাতে ঘুম থেকে ওঠার পরে বুকে ও মাথায় বড়ই ব্যথা অনুভব হতে লাগল। নিশ্বাসপ্রশ্বাসেরও একটু কষ্ট হচ্ছিল। খুবই সর্দি হয়েছে দেখলাম। একটা 'অ্যাসপিরিন' বড়ি খেয়ে কাছের এক পর্তুগিজ ডাক্তারকে হাত দেখালাম। তারপর এক শিশি ঔষধ কিনে হোটেলে ফিরলাম। পথে এক শিখ পুলিশের সঙ্গে দেখা। সে একজন দেশের লোক দেখে আমার সঙ্গে পরিচয় তো করলই, অধিকন্তু আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন স্টিমারে আবার হংকং ফিরে গেলাম।

হংকঙে ফিরে দুদিন হোটেলে কেবল বিশ্রাম নিলাম। শরীরের দুর্বলতা ও অবসাদ অনেকখানি কেটে গেল। তৃতীয় দিনে বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ক্যান্টন রওনা হলাম। হংকং হতে সাইকেলে ক্যান্টন যেতে হলে ফেরি পার হতে হয়। দশ সেন্ট দিয়ে ফেরিতে কাওলিন গিয়ে ক্যান্টনাভিমুখী বড় রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটির অনেক স্থানই পিচ ঢেলে তৈরি করা। ব্রিটিশ সীমানায় পঁচিশ মাইল পরিমাণ রাস্তা খুবই ভালোভাবে রাখা হয়েছে। তারপরই রাস্তার অবস্থা একদম খারাপ। ক্রমাগত চড়াই ঠেলে উঠতে লাগলাম। মাঝে মাঝে রাস্তার দুধারে চা ও খাবারের দোকান। পথে তিন রাত্রি কাটিয়ে দুপুরে ক্যান্টন পৌঁছলাম। ক্যান্টন পৌঁছে কিন্তু এক অদ্ভুত বিপদে পড়লাম। পথ জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাই না, হোটেলের খোঁজ করলে কেউ দেখিয়ে দেয় না ; স্থানীয় পুলিশের কাছে গেলে সে কথা বলে না, কারো সঙ্গে আলাপ করতে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়ে দেখি অনেক হোটেল। সেখানে থাকবার ঘর চাইলাম। দরদামের কথা দূরে থাক কেউ কথাই বলতে চায় না, খুব বেশি হলে 'খালি নাই' বলে বিদায় করে দেয়। কমসে কম কুড়িটা হোটেল থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ব্রিটিশ 'কনসালের' কাছে চললাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই পথে এক কাফির দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা চা চাইলাম। সকলকেই চা দেওয়া হল, কিন্তু আমার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দেওয়া হল না।

তখন সন্ধ্যা। অনেক দূর থেকে সাইকেলে এসেছি, বিশ্রামের নিতান্তই দরকার। কনসালের সঙ্গে দেখা করে আমার বিপত্তির কথা বললাম। তা শুনে তিনি আমায় চিন পরিভ্রমণের অসুবিধার কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার হংকঙে ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। তবে রাত্রিটা কাটাবার জন্য এক চিনা গুপ্তচরকে আমাকে একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দেবার জন্য সঙ্গে দিলেন। অনেক ঘোরাঘুরির পরে একটা হোটেলে মাটির নীচের তলার একটা কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে সে বিদায় নিল। ঘরের কাছেই এক ড্রাম ভরতি প্রস্রাব, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যে খাবার মিলল তা অখাদ্য। যা-ই হোক কোনো প্রকারে তনুরক্ষা করে শুয়ে পড়া গেল। অবশ্য দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিলাম।

রাত্রি প্রভাত হল। জল চেয়েছিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে একটা জলের কলে হাতমুখ ধুলাম। তারপর হংকঙের সিন্ধি ভদ্রলোকটির পরিচয়পত্রটা নিয়ে তাঁদের ক্যান্টন শাখার উদ্দেশে চললাম। স্থানীয় ম্যানেজারের সঙ্গে যথারীতি সাক্ষাৎ হল। তাঁর টাকা চুরি যাওয়ায় তিনি পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। বেশিক্ষণ আলাপাদি করতে পারলেন না, তবুও আমাকে ভরপেট চা রুটি প্রভৃতি খাওয়াবার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে গেলেন। খাবার খেয়ে আবার রাস্তায় বের হলাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। আমার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই

ব্যর্থ হল।

বেলা তখন প্রায় দশটা। সান ইয়াৎ সেন বাগিচার রেলিং ধরে আকাশপাতাল ভাবছি, এমন সময় পিছন থেকে চিনা গলায় কিলিং কুই অর্থাৎ কালো ভূত বলে কে ডাক দিল। পিছন ফিরেই দেখি সিঙ্গাপুরের এক চিনা বন্ধু। তাকে আমার বিপত্তির সব কথাই বললাম। সে কেবল হাসছিল। বেশ খানিক হেসে নিয়ে বলল যে আমার পোশাকটাই যত বিপত্তির কারণ। যে পোশাক পরে পথ চলছি সে পোশাকটা জাপানি চাষিরা সাধারণত ব্যবহার করে। চাষিরা তাই আমাকে জাপ্পুন কুই অর্থাৎ জাপানি ভূত বলে মনে করেছিল। জাপানিদের মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের জন্য চিনারা তাদের বড় ঘৃণা করে ও যথাসম্ভব বয়কট করে চলে। কাজেই আমাকেও জাপানি মনে করে এত অসুবিধায় ফেলেছিল। বন্ধুটি তখন আমাকে এক দর্জির দোকানে নিয়ে গেল। তারপর একটা ব্যাজ তৈরি করিয়ে তাতে হিন্দু ইয়াংসি সাই কাই লিখিয়ে আমার বুকে এঁটে দিল। পড়ল ৪০ সেন্ট। চিনা কথাগুলির অর্থ হল হিন্দু ভূ-পর্যটক।

আশ্চর্য, এই নূতন ব্যাজ বুকে পরে রাস্তায় এসে দেখি একেবারে অন্যরকম অবস্থা। হঠাৎ আদর অভ্যর্থনা যেন প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই চারিদিক থেকে বর্ষণ শুরু হল। হোটেলে ফিরতেই মালিক নমস্কার করে বললেন, আপনাকে জাপ্পুন কুই ভেবেছিলাম, কতই না কষ্ট হল ইত্যাদি। তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভালো কক্ষটি আমার জন্য ঠিক করা হল। জিনিসপত্রাদি সব তিনিই ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। আমাকে অতি সমাদরে স্নানাদির ব্যবস্থা করে দিলেন এবং থাকা-খাওয়ার সকল রকম সেরা ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্যান্টনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হোটেল 'এশিয়া হোটেল'-এ গেলাম। মালিক আমার দুই বেলা খাওয়ার এবং চা পানাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর পূর্ব দিনের বিপত্তির কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। হাটে মাঠে, পথেঘাটে, অলিতেগলিতে যেখানেই যাই সেখানেই চিনা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কত আপনজনের মতো আলাপ আপ্যায়ন করলেন! এঁদের সকলকারই ভারতের জন্য বেশ সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে! হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য এঁদের বিশেষ প্রীতি দেখা যায়। কাজেই নূতন বন্ধু ও সঙ্গী অনেকেই জুটে গেল। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর বাবা পার্শি, মা চিনা। ভদ্রলোকটি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যান্টনের দ্রষ্টব্যগুলি দেখালেন।

ক্যান্টনে ট্রাম লাইন আছে, কিন্তু ট্রাম চলে না। রিকশাওয়ালা দেখল যদি ট্রাম চলে তবে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাই তারা ধর্মঘট করল। হাজার হাজার লোক মিলে একদিন ট্রামলাইন অনেকখানি তুলে ফেলে দিল। গুলি চলল, কতকগুলি লোক মরণকে বরণ করে নিল, তবুও শহরে আর ট্রাম চলতে দিল না। যারা মরল, তারা তাদের সহকর্মীদের পথ সুগম করে দিয়ে গেল। ধনীরা তাদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিল। জগৎ জুড়ে তাদের কুৎসা রটে গেল তবু তারা তাদের ভাতের ব্যবস্থা বজায় রাখল। এমনি করেই মহাচিনে কমিউনিস্ট গজায়।

সাধারণত রবিবার দিন সান ইয়াৎ সেনের মর্মরমূর্তি দেখবার জন্য বহু লোক জড়ো হয়। আমিও সেদিন তা দেখতে গেলাম। বহু জনসমাগম হয়েছিল, কিন্তু গোলমাল একটুও ছিল না। চারিদিকে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং পবিত্র আবহাওয়া বিরাজ করছিল। উপস্থিত চিনা যুবক যুবতীদের একে একে নব্য চিনের জন্মদাতার পদতলে তাদের হৃদয়-নিংড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখলাম। নীরব শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে তাদের পুণ্যাত্মা দেশনায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করার একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল!

সেখান থেকে সান-ইয়াৎ-সেন-বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরবার সময় এক চিনা যুবক আমাকে একটা হলে নিয়ে তাদের সকলের সামনে কথা বলতে পীড়াপীড়ি করল। দেখলাম দশ মিনিটের মধ্যেই মস্ত বড় হলটা ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বলবার জন্য দাঁড়ালাম। একজন উৎসাহী যুবক আমাকে হিন্দু ভূ-পর্যটক ও কবি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক বলে পরিচয় করিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে যেন কিছু বলি সেই অনুরোধও এল। ভারতের ব্যথা-বেদনার কত কথা আছে তাই বলতে দাঁড়িয়ে দেখি, সবাই যেন এক দুঃখের সুরে ভরপুর হয়ে উঠতে চাইল। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানমান দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যে কোন্ অতল তলে তলিয়ে যেতে বসেছে, আমাদের মানবতা যে কীরূপে নিঃস্ব ও নিঃসহায় হয়ে পড়েছে তারই দুচারটা নিবেদন করতে মাত্র প্রয়াস পেলাম। জাতীয় জীবনের অন্ধকারের মধ্যেও আমরা যে আশার রেখাটি ক্ষীণভাবে উদ্ভাসিত রাখার চেষ্টা করি, তাও একটু বলেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের প্রচেষ্টায় আমরা আবার মানুষ হয়ে উঠব,

দেশের ও দশের সর্বপ্রকার উন্নতির সম্যক ব্যবস্থা করে নিতে পারব এই কথা বলে নেমে এলাম। করতালি চলল আধঘণ্টা। তার পর এই ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সাড়ম্বরে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তারা মার্কিন, আইরিশ, জার্মান ও রুশ অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সবাই কঞ্চির সাহায্যে খাচ্ছিল। আমি তা পারি না দেখে একজন উৎসাহী ছাত্র আমাকে কঞ্চির দ্বারা খাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিল। সে হেসে বলল, এই হিন্দু বিদেশী, এখন সমগ্র চিনজাতির ছোট ভাইয়ের মতো। একে আমাদের সকলেরই যথাশক্তি সহায়তা করা প্রয়োজন। সামান্য উক্তি হলেও এটি আমার মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছে তা সহজে আর মুছে যেতে পারে না। খাওয়ার পর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিন নদী পার হয়ে ওপারের বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখতে গেলাম। সেখানে ছাত্রেরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়ল না! খাওয়া হয়ে গেলে অনেক ছাত্র— কেউ টেবিলের চারিদিকে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে— ভারতের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল।

ক্যান্টন হতে সিউচো, ইয়েং-চি-সিয়েন, সিয়াংটাং হয়ে আমি চাংসা যাই। সিয়াংটাং থেকে পাক্কা ৮ ঘণ্টা সাইকেলে চড়াই উৎরাই ঠেলে রাত্রি ৪টায় চাংসায় পৌঁছলাম। ছোট পাহাড়ের কোণে জনবিরল উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ। রাস্তায় চলতে চলতে কখনো দূরে, কখনো-বা কাছে ছোট ছোট বস্তি চোখে পড়ল। অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপরে চিনা কুঁড়েঘর এবং মাঝে মাঝে উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজির শোভা দূর হতে মনকে বড়ই মুগ্ধ করেছিল। অনবরত সাইকেল চালানোর ফলে পায়ের মাংসপেশি ব্যথায় টনটন করতে লাগল এবং হাঁটু ও গোড়ালি অসাড় হয়ে আসছে মনে হল। ব্রেক কষে হাতের কবজিও ধরে গিয়েছিল। সিয়াংটাঙে ২-৩ দিন বিশ্রাম করে শরীরে যে তাকতটুকু সঞ্চিত হয়েছিল তা এই একদিনেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

চাংসা একটি বড় শহর, প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী। লোকসংখ্যাও বোধ হয় দশ লক্ষের কম নয়। সামরিক কর্মচারী এবং পল্টনের লোকও সেখানে খুব বেশি দেখলাম। এখানে একটি বিলাতি পেট্রোল কোম্পানির বড় আড্ডা আছে, তাতে অনেক ইউরোপীয় কাজ করে। মিশনারিদেরও একটা ছোট রকমের আস্তানা আছে। নদীতীরে যে হোটেলে থাকতাম তার কাছে ইউরোপীয়দের একটা ক্লাবও ছিল। রাত্রি ৮টায় পৌঁছে শ্রান্ত দেহে খাওয়া ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সেরে যে একটু সুস্থিরমতো ঘুমাব তাও ভাগ্যে জুটল না। রাত্রি দুটো-আড়াইটা পর্যন্ত নৃত্যগীত চলায় আমার ঘুমও রাত্রির মতো অবসর নিল। পরের দিন প্রাতে হিন্দু ডাক্তারের খোঁজে বের হলাম।

শহরের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু ডাক্তার। সকলেই তাঁকে চেনে। তাই খুঁজে বের করতে মোটেই আর বেগ পেতে হল না। দেখলাম, দুটি বড় রাস্তার মোড়ের উপর একটা বড় হলঘরের দরজায় 'হিন্দু চক্ষু-বিশেষজ্ঞ' সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নানাবিধ অভিজ্ঞতার পরিচয় লিখিত আছে। তারই ভিতরে এক সহকারিণী চিনা যুবতী আগন্তুকদের রোগের প্রাথমিক বিবরণাদি গ্রহণ করছেন এবং ভিতরের কামরায় ডাক্তার চিকিৎসাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। আমি একজন হিন্দু 'সাই কাই' এই পরিচয় দেওয়ায় সহকারিণী আমাকে পাশের একটি কামরায় প্রবেশ করিয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার সাহেব এলেন। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে দেখলাম, তিনি ইসলামি কায়দায় 'আদাব' দিলেন এবং খাঁটি পুস্তু ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন। ভারতীয়ের মুখে পুস্তু শুনে তিনি হিন্দি জানেন কি না এবং তাঁর আসল নিবাসটা কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলাম। ভাঙা হিন্দিতে জবাব দিলেন যে তিনি সীমান্তপ্রদেশবাসী এবং পদব্রজে চিনা তুর্কিস্থান দিয়ে সাংহাইতে এসে বর্তমানে চাংসায় ডাক্তারি করেন। সামান্য আলাপাদির পর দ্বিপ্রহরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডাক্তার সাহেবের নিকট হতে স্থানীয় কলেজ ও হাসপাতাল দেখবার জন্য বিদায় নিলাম।

একটা কলেজে ঢুকে তার ইমারত দেখে বেশ একটু মনে মনে তারিফ করছি এমন সময় কোথা থেকে একেবারে গুজরত (খোদ) মার্কিন অধ্যক্ষ এসে আমি কে এবং কেন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি তা জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দেওয়ায় তিনি একেবারে একগাল হেসে কতকগুলি চিনা ছাত্রকে ডেকে আমাকে সব দেখাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর রাশভারী চালে জলযোগ করবার জন্য বিদায় হলেন। কিন্তু এবার আচ্ছা বিপদেই পড়লাম! আমি মনে করেছিলাম যে নিরিবিলি সব দেখেশুনে নিজের পথে বের হব। তা তো হলই না, অধিকন্তু আমি একেবারে ভিমরুলের চাকে পড়ে গেলাম। তখন প্রশ্নবাণের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল। হংকং ও ক্যান্টনের মতো আমার অনভ্যাস সত্ত্বেও এদের কাছে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করতে হল। বক্তৃতার পর যে প্রশ্নবাণ বর্ষণ হল তা আরও ভীষণ। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, কায়িক,

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ এমন কোনো ষ্ণিক প্রত্যায়ান্ত শব্দ ছিল না যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা না হয়েছিল। বিদ্যাহীনের বিড়ম্বনা যে কতখানি তা এই পথ চলার মাঝে বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কলেজ পর্ব শেষ করে হাসপাতাল দেখতে গেলাম। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, ছাত্রীদের সেবা এবং রোগীর নির্বিকার ভাব বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বেশিরভাগই মার্কিন। সারা হাসপাতাল ঘুরে একজন অল্পবয়স্ক চিনা ডাক্তার আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। হাসপাতালের বৈশিষ্ট্য এই যে কোথাও একটু টুঁ শব্দ নাই।

চাংসার হিন্দু ডাক্তার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের একজন পর্বতবাসী মুসলমান। সুদূর চিনে থেকে থেকে আমাদের ভারতের মুসলমান নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা বা 'জিন্নার চোদ্দ-দফার' ছোঁয়াচ হতে এই ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সংখ্যালঘিষ্ঠতা বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের বালাই এঁর আদৌ নাই। ভারতের মুসলমানেরা যদি প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সহৃদয়তা একবারও দেখে আসেন তা হলে হয়তো প্রভূত পরিমাণে এই সাম্প্রদায়িক কামড়া-কামড়ির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ি ফিরে যেতেই তিনি নিকটস্থ এক চিনা মুসলমান মসজিদে আমাকে নিয়ে গেলেন। মসজিদের ইমামের সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। চিন পরিভ্রমণে কোনো কষ্ট হয়েছে কি না তা তিনি জানতে চাইলেন। ভবিষ্যতে পথে যাতে থাকা-খাওয়ার জন্য কোনোরূপ অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য তিনি চিনা ভাষায় একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "এই পত্রবলে আপনার ভ্রমণপথে আপনি চিনের সর্বত্র চিনা মুসলমানের বাড়িতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন এবং সকল রকম সহায়তা ও সাহায্য পাবেন।" ইমামের এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডাক্তার সাহেবের সহিত ফিরে এলাম। পরিপাটি আহারের কাজে ডাক্তারের সহৃদয়তাই বেশি ভালো লেগেছিল। ভারতের দুই প্রান্তের দুইজন অধিবাসী, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কতই না নিবিড়! তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হতে হয়। উভয়ের শুভ-পরিচয় ক্ষণিকের হলেও বিদায়বেলায় তাঁর গাঢ় আলিঙ্গন মনে পড়লে আজও প্রেম-প্রীতির নির্ঝরে অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে।

পরের দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় এক সভাগৃহে ডাক্তার সাহেবের চেষ্টায় এক জনসভার বন্দোবস্ত হয়। ডাক্তার সাহেবের সহিত নির্ধারিত সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি, বৃহৎ হলটি পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জন ১৫-২০ ইউরোপীয় উপস্থিত হয়েছেন। সভায় ডাক্তার সাহেবই সভাপতিত্ব করলেন। চাংসার জনসাধারণের সমক্ষে ভারতের ব্যথার কথা সাধ্যানুসারেই নিবেদন করলাম। ইতিমধ্যে ভারত সম্বন্ধে এত বেশি বলা হয়েছে যে একপ্রকার কণ্ঠস্থ বলার মতোই বলে গেলাম। অহিংসা ও অসহযোগী সম্বন্ধে তরুণ চিনের জানবার আগ্রহ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

আমার বক্তৃতার পর একজন মার্কিন অধ্যাপক বক্তৃতা করলেন। অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ প্রশংসা করে অধ্যাপক বললেন যে ভারতের ধর্ম, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের ন্যায়শাস্ত্র পৃথিবীকে এক সময় আলোকিত করেছিল। এখন গান্ধীর এই অহিংসা ও অসহযোগ জগতের ভাবধারায় আবার যুগান্তর আনয়ন করবে ইত্যাদি। দেশের সর্বজনপূজিত মহাত্মা গান্ধীর সুনাম বিদেশীর মুখে শুনে অত্যধিক আনন্দ হল। একজন জার্মান অধ্যাপকও বক্তৃতা করতে উঠলেন। তাঁর নাকি চাংসা নগরে চিন্তাশীল পণ্ডিত বলে খুবই সুখ্যাতি আছে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি ভারত সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি। ভারতের বেদ, বেদান্ত, গীতা, সংহিতা, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারতীয়েরা তর্কশাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত। কিন্তু বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা এতই পিছিয়ে পড়েছে যে নিজের দেশের শাস্ত্রের সম্যক অর্থ উপলব্ধি করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা গীতা পড়ে ভক্তি নিয়ে, কিন্তু বাস্তবজীবনে তা প্রয়োগ করার কৌশল তারা বিস্মৃত হয়েছে। ক্রমাগত এবং অনুক্ষণ পারত্রিক ছায়ার পিছনে ছুটাছুটি করতে করতে তারা জাতীয় জীবনের পরম খেয়া প্রাণ উন্মাদিনী শক্তি খুইয়ে বসেছে।" গান্ধী কর্তৃক অনুসৃত অহিংসা নীতিকে তিনি কঠোর রূপেই আক্রমণ করলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে বললেন, "পৃথিবীতে যত স্বাধীন জাতি আছে তারা সবাই মাংসাশী। সবজি-ভোজী হাতির পিঠে মানুষ চড়ে, শক্তিশালী মহিষের গলায় জোয়াল ওঠে, কিন্তু মাংসাশী জীব শৃগালও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।"

সকালে ইউরোপীয় কায়দায় সাজানো একটা স্থানীয় হোটেলে চায়ের নিমন্ত্রণে ইউরোপীয়দের সঙ্গে বৈঠক হল। একজন ইউরোপীয় উপদেশ দিলেন যে পরিভ্রমণের সময় রাজনীতি চর্চা যেন কখনো না করি। কারণ এতে অনেক সময় ফ্যাসাদে

পড়তে হতে পারে। তথাস্তু, আমারও রাজনীতি চর্চা করার অভ্যাস মোটেই নাই। পথ চলাই আমার একমাত্র নেশা। এখানে একজন সিনেমার ম্যানেজারও উপস্থিত ছিলেন! তিনি আমাকে বায়োস্কোপ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। চায়ের বৈঠক থেকে উঠে প্রাদেশিক লাটসাহেব 'জেনারেল হো'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর ইংরেজি-জানা একজন কেরানি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে জেনারেল সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। জেনারেল সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান একেবারে নাই বললেই হয়। কাজেই উক্ত কেরানির মারফতেই আমাদের সামান্য আলাপাদি হল। বিদায়ের সময় জেনারেল হো জানালেন যে হাংকোতে সাইকেলে গেলে বড়ই নাকি বেগ পেতে হবে, কারণ প্রবল বন্যায় হাংকোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভেসে গেছে এবং বন্যাত্রাণ কার্য আরম্ভ করতে হয়েছে। সেই জন্য হাংকো পর্যন্ত ট্রেনের ভাড়া বাবদ ৫০ (চিনা) ডলার তিনি আমাকে একরূপ পীড়াপীড়ি করেই দিয়ে দিলেন।

আজ চাংসা হতে বিদায়ের পালা। ঘুম থেকে উঠেই দেখি, পরিচিত অপরিচিত অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। হোটেলওয়ালা খাবার নিয়ে এল। খাবার যা দিয়েছিল, তার অর্ধেকটাও খেতে পারলাম না। যাবার বেলা পেট ভরে খেয়ে নেওয়া বড়ই মুশকিল। অনেক দিন চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠিনি। পরিচিত বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সাইকেলে উঠে পড়লাম। স্নেহ, দয়া, মায়া সব পিছনে পড়ে রইল। এবার হাংকো আমার গন্তব্য স্থান। কাজেই শুধু হাংকোর কথাই মনে পড়তে লাগল। এত করে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম তা নিমেষে ছিন্ন হয়ে গেল। শহর ছেড়ে একটু দূরে এসেই জেনারেল হোর কথা মনে করে একটু ভাবনায় পড়লাম। কারণ তিনি বলেছিলেন যে হাংকোর পথ জলে ভেসে গেছে, আর সে পথে বন্যাগ্রস্ত ব্যক্তিরা একটু অত্যাচারও করতে পারে। যদি চলতে হয় তবে মনের মধ্যে এসব ভাবনার মোটেই স্থান দিতে নাই। তাই পরমুহূর্তেই ভাবনা দূর করে দিলাম।

মাইল পাঁচেক দূরে এসেই দেখি, পথটা তিন ভাগ হয়ে তিন দিক হতে হাতছানি দিচ্ছে। ভাবতে লাগলাম কোন্ দিকে যাই। চিনের সাধারণ লোককে কখনো কোনো স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলে তার কোনো হদিশ পাওয়া মুশকিল। কারণ একই স্থানের নাম নানাভাবে উচ্চারিত হয়। যাকে মুকডেন বলা হয় তাকে কেউ কেউ ফেনটিংও বলে। এই ক্ষেত্রে মানচিত্র দেখে গন্তব্য স্থানের পথ বের করতে হয়। চিনা মানচিত্রে পূর্ব হতেই বড় বড় স্থানগুলি চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম। এক গোবেচারি চিনা মজুর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকেই পথের সন্ধান বলে দেবার জন্য মানচিত্র দেখাতে লাগলাম। মানচিত্রে হাংকো শহরটি দাগ দেওয়া ছিল। আঙুল দিয়ে স্থানটি দেখাতেই সে পথ বলে দিল। পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি ভারতের কথা মনে পড়ল। আমাদের দেশে মানচিত্র দেখে ক'জন এরূপ অনায়াসে পথ বলে দিতে সক্ষম হয়?

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। কিছুই নূতন ঠেকছিল না। একদিন গেল, দুদিন গেল, তারপরই মনে হল যেন নূতন কিছু দেখতে পাচ্ছি। জেনারেল হো যা বলেছিলেন তার কতকটা যেন মিলে যাচ্ছিল। ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরে ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা অলসভাবে গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই তারা কিছু সাহায্য করবার জন্য বলছে। এই হল এক গোছের ভিখারি। অন্য ধরনের ভিখারিগুলি লেফ্‌ট রাইট, কুইক মার্চ করে গ্রামগুলির বুকের উপর দাঁড়িয়ে গৃহস্থকে চাঁদা দিতে বাধ্য করছিল, এভাবে তারা চাঁদা আদায়ও করছে দেখতে পেলাম। এতেও গ্রামের লোকজন ত্যক্তবিরক্ত হচ্ছে না, যার যা সাধ্যে কুলায় সে তা-ই হাসিমুখে এগিয়ে দিচ্ছে। সেই দানের ভিতরে কতই না আন্তরিকতা! দেখলে বেশ আনন্দ হয়। আমার কাছে কয়েকটি ছেলে মাথা হতে টুপি খুলে ইউরোপীয় কায়দায় ভিক্ষা চাইল। টাকার ব্যাগে যা ছিল তাই উজাড় করে দিয়ে দিলাম। ছেলেগুলি এতে তৃপ্ত হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হল। এখন আমি স্থির করলাম, যদি পৌঁছতে পারি তবে কোনো রেল স্টেশনে গাড়ি ধরবই। পথঘাট তত ভালো নয়। স্থানীয় লোককে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বড় একটা জবাব দেয় না। গ্রাম্য হোটেলগুলিতেও থাকবার স্থান পাওয়া যায় না। এখানে এসে অন্যান্য স্থানের থেকে একটা পরিবর্তন অনুভব করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো এরা আমাকে অন্য কিছু মনে করে, কিংবা জাপানিও ভাবতে পারে। কার মনে কী আছে তা জানি না, কিন্তু এদের এই নিষ্ক্রিয় অসহযোগ ভালো লাগছিল না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এখন আর হোটেল ছাড়া খাওয়া মিলে না, যা মিলে তাও অনেকটা অখাদ্য। তারপর ভিখারির দলেই সব জায়গা ছেয়ে গেছে। আমার মতো শখের

ভিখারির কে তোয়াক্কা রাখে? হাংকোতে পৌঁছতে এখনও অনেকদিন লাগবে। আমার হিসাব মতো রেল স্টেশনে পৌঁছবার জন্য প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে চলছিলাম। পা দুখানা প্রায় প্রত্যেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছিল। তারপর আজ মনটাও বেঁকে বসল। বিকাল বেলায় একটি ছোট গ্রামে কোনোরকমে পৌঁছলাম। কিন্তু হঠাৎ ক'টা ছোকরা এসে আমার পিছন নিল। তারা কখনো সাইকেলের আগে, কখনো বা পিছনে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা ঢিল যে ছুড়ছিল না তাও নয়, কিন্তু সবই সহ্য করে নিচ্ছিলাম। অনেকবার হাসতে চেষ্টা করেছি, পেরে উঠি নাই। হাসির উৎস যেন শুকিয়ে গিয়েছে। ছেলেরা দলে ক্রমেই ভারী হচ্ছিল। আমার ইচ্ছা হল, ওদের পিছনে রেখে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে এই বিশ্রী কাণ্ড হতে রেহাই পাই, কিন্তু পা যে চলছিল না। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এক বৃদ্ধ ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। আমাকে নাকাল করেছে দেখে বৃদ্ধ ছেলেদের বেশ একটা ধমক দিলেন। ছেলেগুলি এদিক সেদিকে পালিয়ে গেল।

আমি বৃদ্ধের ঘরে গিয়ে দেখি, সেটা একটা চায়ের দোকান। এক পেয়ালা চিনা চা এবং একটা তিলের পিঠা তাঁকে দিতে বললাম। বৃদ্ধ সানন্দে আমাকে সেগুলি দিলেন। তারপর বৃদ্ধকে আমার অটোগ্রাফ বইটা দেখতে দিলাম। তিনি বেশ মন দিয়ে তা পড়লেন। তারপর বইটা ফেরত দিয়ে একখানি রেকাবিতে আমাকে ভাত এবং সামান্য তরকারি খেতে দিলেন। এরূপ রেকাবিতে খাবার দেওয়া চিন দেশে এই প্রথম দেখলাম। খেয়েই কাছের একটা বেঞ্চে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম তখন গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। দোকানে কয়েকজন লোক বসে মৃদুস্বরে গল্পগুজব করছে আর মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে! আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা কোথা হতে একটা লম্বা টেবিল এনে তাতে নানা রূপ খাদ্য সাজিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এসে আমাকে গরম জল এবং একখানা পরিষ্কার গামছা দিয়ে গেলেন। আমি হাতমুখ ধুয়ে শরীর ও মনটাকে চাঙ্গা করে খাবার টেবিলে বসলাম। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয় সবই ছিল! ভূরিভোজনের কসুর হয় নাই! ভাবলাম, হয়তো বিছানা দেবে না, তাই নিজের বিছানা খুলে ঘরের এক কোণে তা বিছাতে লাগলাম। বৃদ্ধ এসে ইঙ্গিতে জানালেন যে বিছানার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাজেই আমার বিছানা গুটিয়ে রাখলাম। যারা আমার সঙ্গে বসে খেয়েছিল তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না।

বৃদ্ধ ঘরের ভিতর কী জানি খোঁজাখুঁজি করছিলেন। তিনি একখানা লম্বা দা এবং একটা মোমবাতি বের করলেন। মোমবাতিটা বোধহয় আমার হাতের দেড় হাত লম্বা হবে। বৃদ্ধের হাতে দুই টিন সিগারেট, দুটি দেশলাই, এক কেটলি চা— আরও কত কী ছিল এখন আর তা মনে নাই। তবে ধারণা হল, হয়তো পরদিন কোনো পর্ব হবে, নতুবা এরূপভাবে তিনি ছোট ছোট জিনিস খুঁজে বের করেছেন কেন? যারা আমার সঙ্গে খেয়েছিল তারা অনুমান এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসেই বৃদ্ধের কাছে কী বলল। বৃদ্ধ আমাকে শুতে যাবার ইঙ্গিত করলেন। তিনি যে সব সরঞ্জাম একত্র করেছিলেন, লোকগুলি তা সবই হাতে করে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ ঘরের দরজায় তালা দিলেন। আমরা অন্ধকার পথে এসে দাঁড়ালাম। কী ভীষণ সে অন্ধকার! হয় মেঘ অন্ধকারকে ঘনীভূত করেছিল, নয় আমার চোখের জ্যোতিই কমে গিয়েছিল। বৃদ্ধ আমার কাছ দিয়ে চলছিলেন। বৃদ্ধের হাতে দা-টি দেখে আমার বড়ই ভয় হচ্ছিল। এ কি নরবলির ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? আমাকে এত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন? মনে মনে স্থির করলাম, বৃদ্ধের শরীরে যে শক্তি আছে, তাতে যদি আমি তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে দা-টা কেড়ে নেই, তবে বৃদ্ধ কিছুই করতে পারবেন না। তারপর যে দা দিয়ে আমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে তা দিয়ে অন্তত দু-একজনের মুণ্ডপাত না করে আমি নিহত হব না।

পথ চলার বিরাম ছিল না, আমার মনে হয় গ্রাম ছেড়ে অন্তত অর্ধমাইল দূরে চলে এসেছি। একে অন্ধকার, তার উপর একটা গভীর নিস্তব্ধতা। আমার শরীরটা যেন ছমছম করতে লাগল। আর কিছু দূর এগিয়েই একটা আলো দেখে ভয় অনেকটা চলে গেল। কাছে গিয়ে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি দেখলাম, কিন্তু তা পরিত্যক্ত হলেও বেশ সাজানো গুছানো ছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করতেই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। এরূপ দুর্গন্ধ শুধু চিন দেশে নয়, ফরাসি দেশের প্যারি নগরের বুকের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে বয়ে যায়। এ নিয়ে চিনাদের গালি দেওয়া কিংবা নাক সিঁটকানো ভালো মনে করি না। প্রায় অর্ধেকটা ঘর জুড়ে মাচা করে তার উপর বিছানা পাতা হয়েছে। এই বিছানায় ইচ্ছা করলে পঁচিশজন লোকও আরামে শুতে পারে। হয়তো আমরা সবাই শোব, তাই এ ব্যবস্থা।

বিছানার পারিপাট্য দেখে বেশ আনন্দ হল। এরূপ বিছানায়

অনেকদিন শুইনি। তার ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র মশারি টাঙানো রয়েছে। এ ছাড়া এই মশারিটার ভিতরে একটা মোমবাতিও মিট মিট করে জ্বলছে। বৃদ্ধের সঙ্গে আনীত কেটলি, দুটি দেশলাই, সিগারেট সবই মশারির ভিতরে বালিশের কাছে রাখা হল। তারপর বড় মোমবাতিটিও জ্বালানো অবস্থায় রইল। ঘরখানি আরও আলোকিত হলে বৃদ্ধ আমাকে শুতে ইঙ্গিত করলেন এবং সবাই মিলে আমাকে চিনা ধরনের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। বিদায়ের বেলায় দেখলাম, বৃদ্ধ তাঁর বড় দা-খানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। আমাকে এগিয়ে দিবার জন্যই যে এ রণসজ্জা হয়েছিল তা ভেবে মনে মনে একটু হাসলাম। যে ঘরে শুলাম তার সামনের ও পিছনের দরজা দুটি ঠিক মুখোমুখি ছিল, কিন্তু তাতে কোনো কপাট ছিল না। তবে কপাট থাক আর না-ই থাক আমার তাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ চিনের ডাকাত, চোর, জলদস্যু সব বেটাকেই দেখে নিয়েছি। কেউই তো প্রাণে মারে না। তবে আর ভয় কী? বিছানাতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তার খেয়াল ছিল না।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আটটা বোধ হয় বেজে গেছে, আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। তাই এক লাফেতে বিছানা হতে উঠে যেমনই মাটিতে নামব, অমনি সাজানো মাচার একপাশে অসাবধানতাবশত আমার পা পড়তেই বিছানা সমেত তা আমার গায়ের উপর পড়ল। শরীরটা কেঁপে উঠল! একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেই ব্যাপারখানা কী বুঝলাম। এক দুই করে গনে দেখলাম, আটটি মৃতদেহপূর্ণ কফিনের উপর বিছানা পাতা হয়েছিল। এই ঘরটা হল চিনাদের কবরস্থানের সদর দরজা মাত্র। ওরা অষ্টমী এবং পূর্ণিমা ছাড়া কখনো কবর দেয় না। এর মধ্যে যারা মরে তাদের এই দুই তিথির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই আটটি কফিনে আটটা মৃতদেহ অষ্টমীর অপেক্ষায় আছে। তারই উপর পাতা জমকালো বিছানায় আমাকে শুতে হয়েছিল!

টাকার ব্যাগটা পকেটে পুরে যেমনই ঘর হতে বের হয়েছি, অমনি বৃদ্ধের উপর আমার চোখ পড়ল। তাঁকে একরূপ টেনে নিয়েই তাঁর বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম। বৃদ্ধের বাড়িতে গিয়ে আমার গচ্ছিত বইখানা আদায় করে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে সাইকেলে চাপলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন থেকে কোনো গ্রামে গিয়ে আর স্বাক্ষরের বই দেখাব না। কারণ তার পাতায় পাতায় চিনা ভাষায় লিমনাথ বিশোয়াসী বড়ই সাহসী এবং শক্তিশালী এই কথা কয়টি লেখা ছিল বলেই যে এরা আমার শক্তি ও সাহস পরীক্ষার জন্য আমাকে এত ঘটা করে আটটি কফিনের উপর শুতে দিয়েছিল তা আর বুঝতে বাকি রইল না। বৃদ্ধ চিনা দোকানদারের বাড়ি থেকে বের হতেই, কী জানি এক অদম্য শক্তি জেগে উঠল। পুরাদমে সাইকেলটা চালিয়ে গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। মুক্ত বায়ু ও গ্রামের চারিদিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনটাকে চাঙ্গা করে তুলল। গুন গুন করে গান ধরলাম। যদিও পথঘাট ভালো নয় তথাপি বিজয়ী বীরের মতো চলতে লাগলাম। গত রাত্রের জয় মনে এমন একটা অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করেছিল যে গন্তব্য স্থানে কখন পৌঁছব সে কথা মনেও হচ্ছিল না। পথ পথই— চললে পরেই তা শেষ হবে। আমার প্রার্থনায় কিংবা ক্রন্দনে পথ ছোট হয়ে যাবে না।

হিন্দু ডাক্তারের বন্ধু ইমাম সাহেবের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে মুসলমান চিনাদের নামে একখানি চিঠিও দিয়েছিলেন। তাই আজ একটি মুসলমান চিনার বাড়ি অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা বেশ করে মাথায় পেকে উঠল। গ্রাম এসে গেল, কিন্তু বিকাল না হলে রাত্রি কাটাবার স্থান কেন খুঁজব? আমার চলতি প্রথা মতো একটা বাড়িতে খাবার খেয়ে নিলাম। আজকার দিনটা ভালোই যাবে বলে মনে হল।

চারটের পূর্বে একটা ছোট গ্রামে এলাম। গ্রামখানা পরিষ্কার বললে দোষ হয় না। একটা ঘরের বারান্দায় একখানি বেঞ্চ পড়ে রয়েছিল, তাতেই বসে পড়লাম। গ্রামের লোকের দৃষ্টি এড়াতে পারি নাই। অনেকেই এসে আমাকে এক পলক দেখে গেল, অনেকে কথাবার্তা বলল, আবার অনেকে নিজ নিজ বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইল। আমি ক্রমাগত 'মুসলমান চিনা' শব্দটি আওড়াতে লাগলাম। যে-ই শব্দটি শুনছিল সে-ই আমার প্রতি যেন একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু তারা এমন করছে কেন? এখানেও কি তবে ভারতের মতো হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব? যা হবার হবে। একটা বেঞ্চি তো পাওয়া গেছে। শোবার ভাবনা নাই। দুপুরে খেয়েছি। রাত্রে দুমুঠা ভাত জুটে যাবেই, তবে আর এত ভাবনা কিসের? কিন্তু সত্য বলতে-কি, গ্রামে এসে বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে মন চাইল না। ইচ্ছা হল কারো বাড়িতে, নয় একটা হোটেলে গিয়ে জন্মগত অভ্যাসমতো

সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সময় কাটাই। ঠিক করলাম, হয় আজ মুসলমান বাড়ি যাব, নয় এই বেঞ্চিতেই রাত্রি কাটাব।

সন্ধ্যা হবার একটু পূর্বে একটি যুবক এল। তার মুখ দেখলেই মনে হয়, কী যেন এক মনঃকষ্ট তাকে নিতান্ত পীড়া দিচ্ছে— অথচ সে মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করছে। তাকে 'মুসলমান চিনা' বলতেই সে উত্তর দিল 'হাঁ'। পকেট হতে তাকে ইমানের পত্রখানা দিলাম। সেটা বেশ ভালোভাবে পাঠ করে সে আমাকে 'লইলা' (আসুন) বলল। তারপর সে আমার সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। বেশি দূর যেতে হল না। দূর হতেই গ্রামের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি দেখা গেল। আমার ধারণা ছিল না যে চিনা মুসলমানদের এত বড় বাড়ি থাকতে পারে। সদর দরজা পার হয়ে আমরা একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারই পাশে একখানি ঘর। বাতি জ্বালানো, বিছানা পাতা, দরকারি জিনিস সাজানো, দেখলেই মনে পড়ে বাংলা দেশের ভদ্রলোকের বৈঠকখানার দৃশ্য। যুবক আমাকে ঘরে বসিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে স্নান করব কি না জিজ্ঞাসা করল। আমি সানন্দে জানালাম, হাঁ, স্নান করব।

আমি পথিক, পথের দুঃখকষ্ট এবং ক্লান্তির অপনোদন হয় স্নানে। স্নান এনে দেয় মনের মধ্যে একটা অপরিসীম পবিত্রতা। তাই কাপড় ছেড়ে অন্দরমহলে স্নান করতে গেলাম। বহু ছোট-বড় কোঠা, প্রায় সব ঘরেই লোকজন চলাফেরা করছে। আমাকে তাদেরই পাশ কাটিয়ে স্নানের ঘরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু কেউ ফিরেও তা দেখল না। এ কী আভিজাত্যপূর্ণ ভাবের অভিব্যক্তি! যা হোক তাতে বয়ে গেল। রাত্রিটা শুধু কাটাতে হবে, এর বেশি তো আর নয়! স্নান হলে যুবক আমাকে এক প্রস্ত চিনা পোশাক পরতে দিল। আমিও কোনোরূপ দ্বিধা না করে সেগুলি পরে ঘরে এলাম। চিনা চায়ের পরিবর্তে দুধ-চিনি-দেওয়া চা এবং একখানা ছোট পাউরুটি পাওয়া গেল। পাউরুটি দেখে মনটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে উঠল। সেটা একরকম গিলেই খেয়ে ফেললাম। তারপর চা-পান— যুবকটি আগাগোড়া আমার কাছে সুবোধ ছেলেটির মতো দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম সে আমার খাবার পদ্ধতি ভালো করেই লক্ষ্য করছে। যুবক চলে গেল। তারপর এক অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকেই আমাকে 'সেলাম আলিকম' বললেন। আমি হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করলাম। যে পত্র আমি ইমামের কাছ থেকে এনেছিলাম তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে আমি 'কাফের হিন্দু'।

বৃদ্ধ হিন্দুস্থানে অনেকদিন ছিলেন। দিল্লি, আগ্রা, বোম্বাই এবং কলকাতা তিনি দেখে গিয়েছেন, এ ছাড়া মক্কাও গিয়েছিলেন। তিনি বেশ ভালো হিন্দুস্থানিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর একটি কথাও ভুলবার মতো ছিল না। এখনও ভুলি নাই। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের 'মুসলিম হিন্দুদের' মতো এখানকার কাফের চিনারাও গোমাংস খায়। গোমাংস খায় বলে কাফের চিনাদের উপর তাঁর কোনো রাগ নাই, তবে গাভী হত্যা এবং বিশেষ করে গর্ভবতী গাভী হত্যা তাঁর মোটেই ভালো লাগে না! কাফের চিনারা কিন্তু গর্ভবতী গাভী হত্যা করতে বড়ই ওস্তাদ। প্রথমত তারা পেট চিরে একটি কচি বৎস পায়, তার নখ হতে মুণ্ড পর্যন্ত সুখাদ্য। দ্বিতীয়ত তারা পায় গাভীর স্তনের জমানো দুধ, তা ভেজে সুস্বাদু তরকারি করা হয়। তারপর গর্ভবতী গাভীর মাংসও উপাদেয় খাদ্য। ভদ্রলোক দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "চিন দেশ হতে কাফের চিনারা গোজাতি এমনভাবে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে যে, যে দু-একটা গরু তাঁরা পালছেন তার উপরও কাফেরগুলির সর্বদা লোলুপ দৃষ্টি। এসব গোধন চুরি করতে কাফেরগুলি এত ওস্তাদ যে পকেট-কাটা হতেও গরু চুরি তারা তাড়াতাড়ি করতে পারে। তারপর বধের নিয়মও বীভৎস রকমের। প্রথমত তারা জীবটার ঠ্যাং বেঁধে ফেলে দু-হাত লম্বা একখানা ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। এক বিন্দুও রক্ত মাটিতে পড়তে দেয় না। সব রক্ত একটা পাত্রে ধরে রাখা হয়। ওই রক্ত জমিয়ে তারা ছোট ছোট টুকরা করে কাটে। পরে তা ভেজে তার ঝোল রান্না করে।" বৃদ্ধের কথাগুলি শুনছিলাম, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বের হচ্ছিল।

বৃদ্ধ আরও বলতে লাগলেন, "সেদিন আমারই বাড়ি হতে একটি যুবতী গাভীকে চুরি করে নিয়ে কাফেরগুলি হত্যা করেছে। এই গাভীটির দাম অন্ততপক্ষে দু-শত মেস্ক (চিনা ডলারকে মেস্ক বলা হয়)। কাফেরগুলির অত্যাচার এখন চরমে উঠেছে। টাকা কর্জ নেবে, কিন্তু ফেরত দেবার কথা ওঠালেই তারা তেড়ে আসে। তাদের সংখ্যাধিক্য তো আছেই, তার উপর রাজশক্তিও যেন টলটলায়মান। কে কার দিকে চায়? এরূপ করেই আমাদের দিন কাটছে।"

তারপর বৃদ্ধ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেলেন।

চিনা ধরনেই খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে খেলাম। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে খাদ্যে কোনো রূপ

আমিষ ছিল না, ঘি, মাখন, দই, দুধ এবং ভারতীয় ধরনের তরকারিই ছিল! খাওয়া শেষ করে আবার বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। এবার বৃদ্ধকে কথা বলতে না দিয়ে আমার কথার জবাব চাইলাম। প্রশ্নগুলির জবাব পেয়ে ধারণা হল যে চিনদেশে যত চিনা মুসলমান আছে তারা সবাই হয় ধনী, নয় মধ্যবিত্ত গোছের। গরিব তাদের মধ্যে নাই। সাধারণত তারা ব্যাবসা-বাণিজ্য করে এবং কাফের চিনাদের বাড়িতে খায় না, এমন-কি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেও ভালোবাসে না! যত বড় পদবিধারীই হউক না কেন কাফের চিনারা মুসলমানদের সঙ্গে একত্র বসতে পারে না। তারা কখনো কাফের চিনাদের অভিবাদনও করে না। কাফেররাই আগে অভিবাদন করে আসছে এবং এখনও করে। বৃদ্ধের দুটি নাম— একটি হল মহম্মদ ইব্রাহিম, আর একটি হল মা চেন। এই মা চেন নামেই তিনি লোকসমাজে পরিচিত।

মহম্মদ ইব্রাহিম নাম লোকসমাজে মোটেই না চলবার একটি কারণ হল, কাফের চিনারা আরবি মোটেই উচ্চারণ করতে পারে না। উচ্চারণের চেষ্টা করা তো দূরের কথা, আরবিকে বরং তারা ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে। বৃদ্ধের কাছ থেকে এতগুলি সংবাদ সংগ্রহ করে হাঁপিয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার ইচ্ছা হল। তাই বৃদ্ধকে মুখ ফুটেই বলতে হল যে আমি এখন শুতে চাই। বৃদ্ধ সে রাত্রের মতো আমাকে ছেড়ে দিলেন। এই ক্রমাগত কথা বলার বালাই হতে বৃদ্ধ যেন থামতে চান না। তিনি শুধু নিজেই বলতে চান, অপরের কথা শুনতে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না।

প্রাতে যদিও চলে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবু হাবভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম যে আমি চলে যেতে চাই। বৃদ্ধ আজকের দিনটাও থেকে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। তারপর অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে স্বেচ্ছায় থেকে গেলাম। প্রাতরাশ সমাপন করে ক্ষুদ্র চিনা মুসলমান পল্লিতে বেড়াতে বের হলাম। কয়েকটা বড় বড় বাড়ি, আর তার সঙ্গে বাগান; কিন্তু বাড়িই আছে, লোকজন বড় নাই। চারিদিকে যেন প্রেতপুরীর মতো একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যুবকযুবতী, বালকবালিকা কারো মুখে কথা নাই, মনে আনন্দ নাই। একটা নীরব নিথর নিস্পন্দ ভাব। এদের দেখে হঠাৎ আপনা হতেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল— এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? চিন্তা করতেই পরক্ষণে জবাব মিলল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার অহমিকাই এই সর্বনাশা পথে এদের টেনে নিয়ে গেছে। যদিও খাওয়ার লোভে রয়ে গেছি, তবুও মনটা এ-হেন স্থানে আর যেন তিষ্ঠোতে চাইল না। মুসলমান পল্লি পার হয়েই অন্য চিনা পল্লিতে পড়লাম। অভাব-অভিযোগ এদের লেগেই আছে। ভিখারিরা দল বেঁধে চলেছে। তারপর চলেছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। চাঁদা আদায় নিয়ে এরা ব্যস্ত। এদিকে এসে যেন দেহে প্রাণ এল। হোক এরা গরিব, তবুও এদের প্রাণ আছে। কারণ তারা কথা কইছে, হাসছে, কাঁদছে। অনেকক্ষণ বেড়াতে ভালো লাগল না। কোন্ পল্লিতে আড্ডা নিয়েছি তা এ পাড়ার চিনারা জানে, তাই কেউ আর কথা কইছে না দেখে আমি ফিরে এলাম।

বৃদ্ধ আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আসামাত্রই নানা কথা উত্থাপনের পরে কোয়ান্টাং প্রদেশের অনেক সংবাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কথার যথাযথ উত্তর দিয়ে আমি তাঁর নিকট জানতে চাইলাম যে তাঁরা অন্য চিনাদের সঙ্গে তেমনভাবে মেলামেশা করেন না কেন, আর তাঁদের পাড়ার লোকদের এরূপ নির্জীবতারই বা কারণ কী? বৃদ্ধ তার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে আমার কথা এড়িয়ে গেলেন। আমিও আর জবাব পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করি নাই।

পরদিন প্রাতে গ্রাম ছেড়ে ইউচোঁ নামক শহরে পৌঁছলাম। শহরে পৌঁছেই ছোট একটা হোটেলে গেলাম। ঠিক হল, খাওয়া-শোওয়া নিয়ে সত্তর সেন্ট দিতে হবে। ঘরখানা ভালোই। একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়লাম। অলিগুলি ঘুরে এলাম। এখানে বাস্তবিকই ইংয়াসি নদের প্লাবনের ধাক্কা লেগেছে। মানুষ যে প্লাবনের দ্বারা এত বিপর্যস্ত হয় তা আমার ধারণা ছিল না। তবে এটা চিন দেশ বলেই গরিবের দল এখনও বেঁচে আছে। যার যা সাধ্য তা সে দান করছে। তাতেও হচ্ছে না। গরিবের ক্ষুধা ভয়ানক। অত্যাচারও যে হয়নি তা বলা যায় না। ভিখারিরা স্বভাবভিখারি নয়, এরা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এদের জুলুম দেখলেই মনে হয় যে পেটের ক্ষুধায় অস্থির হয়েই এরা এই দৌরাত্ম্য করছে।

এরপর আমি চিনের বিখ্যাত নান্‌কিন শহরে যাই। নান্‌কিন আমার ভালোই লেগেছিল। নবচিনের জন্মদাতা সান ইয়াৎ সেনের সমাধি, চিয়াং-কাই-সেকের বাড়ি এবং শহরের বাইরে দু-একটা ঐতিহাসিক স্থান দেখে আমি নান্‌কিন ত্যাগ করি। এর পর হতেই আমি গ্রাম্য পথে চলতে শুরু করেছি। অন্যান্য স্থান থেকে এই অঞ্চলের পথে সাইকেল চালানো একটু কষ্টকর বলা যেতে পারে। তার একমাত্র কারণ হল পথগুলি বড়ই উঁচুনিচু। যারা নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নূতনভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে, কমিউনিস্ট আখ্যায় ভূষিত করে যাদের বদনাম রটানো হয়, তাদের গ্রামের

কাছের পথগুলিই চলাচল করার যোগ্য, অন্যান্যগুলিতে পূর্বের মতোই স্থানে স্থানে কাদা জমে রয়েছে, আর তাতে গ্রাম্য শূকরগুলি শরীর ডুবিয়ে নাক ভাসিয়ে দিব্য আরামে আছে। এ ছাড়া দুর্গন্ধ এতই অসহ্য যে পূতিগন্ধ নরক যেন এখানে বাস্তবরূপ নিয়ে সারা অঞ্চলের বাতাস ভারী করে তুলেছে। অথচ এ পথেই আমাকে চলতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেনাদল বড়ই বিরক্ত করছিল, তা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তথাপি আমি এগিয়ে চললাম।

কতদিন চলেছি তার ঠিকঠিকানা নাই। কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি বলে কোনো দিনলিপি লেখার প্রবৃত্তিও হয় নাই। একদিন ঠিক করলাম নদীতীরে যদি পৌঁছতে পারি তবে অন্তত জাহাজে চড়ে সাংহাই যেতে পারব। কারণ এখানকার লোকগুলি পথিককে আর তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে না। হয়তো এরা বিদেশী দ্বারা অনেকবার অত্যাচারিত হয়েছে। বিদেশীর কথা ছেড়ে দিলেও দেশী সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে বড় ভালো ব্যবহার করে না। যারা পল্টনে ভরতি হয়েছে, সরকারকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করছে, তারা তো গ্রামে বসে নাই। তারপর চিনা সৈনিক একটু অন্য রকমের। এরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছে। যখনই তারা বুঝতে পারে যে সরকার তাদের নয়, তখনই তারা বিদ্রোহ করে বসে। ফলে সে একা মরে না, তার আত্মীয়স্বজনের উপরও অত্যাচার গড়ায়। এরূপ ধরনের লোকেরা যে গ্রামে বাস করে হয়তো সেই গ্রামকে গ্রামই তছনছ হয়। কারণ গ্রামবাসীরা আপনজনকে ছাড়তে রাজি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত চিন জাতির চেয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের নামডাক আরো বেশি। দেখলে বুঝা যায় না এই জাতি দ্বারা এত বড় কর্ম সাধিত হতে পারে। তবে এটা লক্ষ করেছি, গ্রামের লোক আমার প্রতি কোনোরূপ ঘৃণা প্রকাশ করছে না বরং দায়ে পড়েই যেন এড়িয়ে থাকতে চায়।

আমার মন একেবারে বদলে গেছে, একটুও ভালো লাগছে না। কী দেখব কী না দেখব তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। তারপর কয়দিন ধরে স্নান হয় নাই, খাওয়াও জোটে নাই। কাজেই মনকে ঠিক রাখা বড়ই কষ্টকর। নদীতীর লক্ষ্য করে চললাম। তিন দিন ক্রমাগত পথ চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে আছি এমন সময় দেখি সম্মুখে আবার পাহাড়। প্রথমত চোখ দুটাকে বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু একটু পরে যখন পাহাড়টির দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি পড়ল তখন এটা যে ঠিকঠিকই পাহাড়, নদী নয় তা বুঝতে বাকি রইল না, আমার মগজও অনেকটা বিগড়ে গেল। ধৈর্য আমার চির সহায়। তাও আর অটল রাখতে পারি না। নির্বাক হয়ে বসেই রইলাম।

রাত্রি অন্ধকার, হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। আমি জনহীন প্রান্তরে একা। ভয় বোধহয় সকলেরই আছে! এরূপ বিজন প্রান্তরে একা রাত্রিযাপন করা আমার ইচ্ছাকৃত কাজ, তাই কারো উপর রাগ হল না, ভয় হল না। কিন্তু অর্শ আবার বেড়েছে, শরীরটা বড়ই খারাপ। এমন-কি মাইল দু-এক যাবার পরই একবার করে সাইকেল হতে নামতে হত। সারাটি দিন এরূপ করে কাটিয়ে নিরালা প্রান্তরে একা থাকাটা সকলের ভালো না-ও লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে বেশ লাগছিল। তার পর চিন দেশে এমন জানোয়ার নাই যে আঁধারে গা ঢেকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বিপন্ন করতে চেষ্টা করবে। এক আছে ভূতের ভয়। যে মরা মানুষের কবর খুঁজে সেখানে রাত্রি যাপন করে, তার কাছে ভূতের ভয় হাসির বিষয় নয় কি? কিন্তু আকাশ হতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। ভাবছিলাম উঠে চলে যাব, কিন্তু কোথায় যাব? সামান্য একটু বৃষ্টি পড়েই তা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই যে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি তা মাটিতে পড়ে একটা গরম হাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাতে একটু বিরক্তি বোধ হয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম এসে তার অবসান করল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন তরুণ সূর্যের রঙিন আলো আমার মুখে পড়ে ঝিকমিক করছিল। শরীরটা বেশ ভালো বোধ করতে লাগলাম। আমি যেন লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলাম। যে অর্শ আমাকে অনবরত রুগ্‌ণ বলে স্মরণ করিয়ে দিত তা অনেকটা কমে গিয়েছিল। এবার সাগরতীর লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম।

সুখশান্তি মানুষের চিরদিন সমভাবে থাকে না! যাদের সঙ্গে এত করে মিশলাম, যাদের সুখশান্তির অনেকটা অংশী হলাম, তাদেরই কতকগুলি লোক আমার প্রতি অত্যাচার করবে তা মোটেই ভাবি নাই। তবে মাঝে মাঝে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে বলে এখন আমার তাদের প্রতি কোনো আক্রোশও নাই। পূর্বেই বলেছি এখন আর আমি গ্রামে থাকি না। একাকী বনেজঙ্গলে শুয়ে থাকি। বোধ হয় পাহাড় ছেড়ে আসার তৃতীয় দিন রাত্রিতে একটি পরিত্যক্ত ছোটঘরে শোবার বন্দোবস্ত করলাম। ঘরটা পাশে আট হাতের বেশি হবে না, লম্বায় হবে অন্তত পঁচিশ হাত। ঘরটার মধ্যে সামনে ও পিছনে দুটি দরজা, তাতে পাল্লা নাই। এ ছাড়া কোনো জানলা ছিল না। ঘরটা দেখে মনে

হল, অনেক দিন সেখানে কোনো লোকজন বাস করে নাই। যাক ঘরটার একপাশে একটু পরিষ্কার করে তাতেই অয়েল ক্লথের উপর কম্বলটা পেতে বিছানা করলাম। আমার কাছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একখানা ধর্ম পুস্তক ছিল। তা খুলে পড়তে লাগলাম। চিনদেশে থেকে চিনাভাবাপন্ন হয়েও নিজের মাতৃভাষায় বই পড়তে বেশ ভালো লাগল। বই পড়ার পর চিনের একটা মানচিত্র দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। কতকগুলি লোক চিনের জাতীয় গান গাইতে গাইতে আমার ঘরের কাছ দিয়েই চলেছিল। চিনের জাতীয় সংগীত এতই বীরত্বব্যঞ্জক এবং প্রাণমাতানো যে তা আশাহীনের বুকেও আশা জাগিয়ে তোলে, দুর্বলের দেহেও শক্তির সঞ্চার করে। সেই গান আমি শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক, সৈনিক বোধ হয়, মলমূত্র ত্যাগ করবার জন্য এই পরিত্যক্ত গৃহে এসেছিল। কিন্তু আমাকে দেখেই সে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে 'জাপ্পুন কুই' ভেবে আমার শান্ত মুখের দক্ষিণ গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করল। আঘাতটির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় আমার গালের উপর তার পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল। চিন দেশে অনেক দিন ঘুরেছি, অনেক কাঁচা মাংসও খেয়েছি, পেঁয়াজের কথা তো না বললেও চলে। কাজেই আমার 'সর্বজীবে দয়া'র ভাব অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যুবক সৈনিকের চিবুকে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি ঘুসি মেরেই একলাফে তার বুকে এমন একটি পদাঘাত করলাম যে তার পল্টনি বুটের লাথির ওজনও তার চেয়ে হালকা। সৈনিকটির কাছে বন্দুক ছিল। উঠে গিয়ে সে যেইমাত্র বন্দুক ধরল অমনি তাকে গুলি করার সময় না দিয়ে আবার তার ডানহাতটা ধরে এরূপভাবে মুচড়িয়ে দিলাম যে তার হাত হতে বন্দুক আপনি পড়ে গেল। সময় ক্ষেপণ না করে তার কোমর হতে কার্তুজ-ভরতি পেটিটা কেড়ে নিলাম। লাঞ্ছিত যুবক মার্কিনি কায়দায় দুটি হাত তুলে ঘর হতে বিদায় নিল। কিন্তু আমার ভাববার সময় নাই। এখনই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সে নিশ্চয়ই তার পল্টনে সংবাদ দিবে এবং আমার নিজেকে রক্ষা করবার আর উপায় থাকবে না। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা একটা দরজায় রেখে দিলাম। তাতে লেখা ছিল হিন্দু পর্যটক। অন্য দিকে আমার রঙিন খদ্দরের চাদরটা হতে এক টুকরা ছিঁড়ে তাকেই পতাকা করে রাখলাম, আর বাকিটুকু দিয়ে পাগড়ি বেঁধে ফেললাম। বন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখলাম তাতে তিনটা গুলি আছে, আর পেটি হতে তাড়াতাড়ি খুঁজে মাত্র ছয়টি গুলি পেলাম। সর্বসুদ্ধ আমার নয়টি গুলি হল। অন্তত নয়টি লোকের জীবন-মরণের কারণ হয়ে আমি মরতে পারব, তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী?

যাদের জাতীয় সংগীত শুনে ঘুম হতে উঠেছিলাম, তাদেরই একজনের হাতের চপেটাঘাত এখনও আমার দক্ষিণ গণ্ডের অনেকটা লাল করে রেখেছে। তার পর ওই আসে সেই পল্টন, যে পল্টন হয়তো জাপানি সৈন্যের রক্তে স্নান করবে। কিন্তু আমার মতো নিরুপায় অস্ত্রহীন লোক আজ তাদের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। আমি একা, আর তাদের সংখ্যা এখনও আমি জানি না। পদশব্দে বুঝা গেল ওরা সংখ্যায় কম নয়। যাদের উন্নতির জন্য সদাসর্বদা চিন্তা করতাম, আজ তারাই আমার জীবননাশের জন্য এগিয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের একটা কোণে গিয়ে ডান হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে দুটা দরজার প্রতি তাক করে দাঁড়ালাম। যদি ওরা প্রথমেই গুলি ছুড়তে থাকে তবে যে-ই প্রথম আমাকে মুখ দেখাবে তাকেই তৎক্ষণাৎ শমনসদনে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কতকগুলি লোক গুলি না করেই ঘরে প্রবেশ করল। তার মধ্যে একজনকে বড়দরের কর্মচারী বলে মনে হল। এক দিকে 'হিন্দু' শব্দটা, আর অন্য দিকে গৈরিক বস্ত্র দেখেই তারা এতক্ষণ আমার প্রতি গুলি ছোড়ে নাই। এই গৈরিক বস্ত্রের আদর এবং সম্মান যদিও চিন দেশ হতে দিনদিনই চলে যাচ্ছে, তথাপি এখনও একেবারে লোপ পেয়েছে এ কথা অন্তত আমি বলতে পারি না। চিনের ধর্মধ্বজীদের হাতে ক্ষমতা গেলে গৈরিক বস্ত্রের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি কমিউনিস্টরা কোনোদিন প্রাধান্য লাভ করে তবে গৈরিকবস্ত্র যে চিন থেকে চিরতরে বিদায় নেবে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাপ্তেন আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। আমি তাঁকে সর্বপ্রথমেই বললাম, আমি এদেশে লড়াই করতে আসি নাই, অনেক আপদ গিয়েছে কিন্তু কখনো হাত উঠাই নাই। আজ দায়ে পড়েই হাত উঠিয়েছি! যদি আমাকে প্রাণে মারা কিংবা অঙ্গহীন করা হয় তবে সেজন্য তিনি দায়ী হবেন। কাপ্তেন তাতে রাজি হলেন। সরল বিশ্বাসে আমার জীবনমরণের ভার কাপ্তেনের হাতে ছেড়ে দিয়ে বন্দুক ও গুলির পেটি অর্পণ করলাম। কিন্তু বোধ হয় মরাই আমার ভালো ছিল। কারণ সেদিন যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত এবং অপমানিত হলাম এ জীবনে সেরূপ

আর কোনোদিন হই নাই। এরূপভাবে এ জীবনে পুনরায় অত্যাচারিত হবার পূর্বে হয় শত্রুর হাতে, নয় নিজের হাতে যেন মৃত্যু হয়! আমাকে সৈনিকরা পঙ্গপালের মতো ঘিরে ভীষণভাবে মারতে লাগল। কিছুক্ষণ প্রত্যাঘাত করেছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত যখন চারিদিক থেকে কিল, ঘুসি, লাথি চলতে লাগল তখন বেশিক্ষণ সজ্ঞানে থাকতে হয় নাই। অজ্ঞান হয়ে থাকা বোধ হয় ভালোই! কারণ তাতে অপমানের গ্লানি ভুলে থাকা সহজ হয়।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম সাদা ধবধবে কোমল এক শয্যার উপরে আমি শায়িত, শিয়রে বসে একটি যুবক আমাকে অবিরাম গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজতে ইচ্ছা হল, তা বুজেও গেল, আবার আমি চেতনাহীন, তারপর আবার হুঁশ হল। তখন শরীরে যেন কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে, কিন্তু মুখ হতে একটু পর-পরই কালো কালো রক্তের চাপগুলি কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল। ভাবছিলাম জীবনের বোধহয় শেষ হয়ে এল। মরবার পূর্বে একখানা চিঠি লিখব। কিন্তু কী লিখব, কাকে লিখব? বেশিক্ষণ আর চিন্তা করতে হল না। আবার চেতনা লোপ পেলে। এই বার নিয়ে চিন দেশে আমার তিনবার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল। তারপর আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী আমার চারিদিকে ঘিরে ছিল। এবার কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার (ছিংছাং) কথা বলতে মানা করলেন।

আমি কথা বললাম না। আমার মুখে কতকগুলি ভাতের মাড় একটা চামচের সাহায্যে ঢেলে দেওয়া হল। একটু নয়, পর পর অনেকখানি। তারপর কতকটা চিনে সাদা চা। খাওয়ার ধরন দেখে অনেকের মুখে হাসি ফুটে এল। কবিরাজ (ছিংছাং) হাত নেড়ে বলছিলেন, "আমার রোগী কখনো মরে না, তা সে যেমনই হোক।" তারপর একে একে ঘর হতে সবাই বিদায় নিলেন, একটি মাত্র যুবক আমার কাছে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আর মাথার চুলগুলিতে আঙুল চালাতে লাগল। যখনই কথার জবাব দিতে উদ্যত হচ্ছিলাম, তখনই তার নিজের মুখে আঙুল রেখে সংকেত জানাচ্ছিল— 'কথা বলবে না।' কিন্তু যুবকের শ্রদ্ধা ও অকপট সেবা পলে পলে আমাকে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল। আমার বুকের উপর একটা পুলটিশ বাঁধা ছিল, ওটা বুকের চামড়াতে আঠার মতো সেঁটে গিয়ে বেশ চুলকাচ্ছিল। যুবককে তা ইঙ্গিতে সরিয়ে নিতে বললাম। কিন্তু সে হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল— না না, তা হবে না, ছিংছাং-এর আদেশ। বাধ্য হয়ে সে যাতনা আমাকে বরদাস্ত করতে হল। বেশিদিন সে অস্বস্তি পোয়াতে হয় নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলটিশটা ফেলে দেওয়া হল। শরীরও অনেকটা সুস্থ সবল হল।

সেদিন মনে হল, সাংহাইয়ের চাপাই অঞ্চল জাপানিরা নিশ্চিত দখল করেছে, নতুবা গ্রামের লোক আমার দৃষ্টি থেকে এমন করে মুখ লুকিয়ে রাখবে কেন? কথাবার্তা, আনন্দ করা বন্ধ করবে কেন? তবু কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে এই চিনাদের জন্মগত সংস্কার, তারা এত বিপদেও নিত্যকার কর্তব্য ভুলে নাই। আমার প্রতি তাদের বেশ সতর্ক নজরই ছিল। একটি যুবতী সেদিন ম্লানমুখে এসে আমাকে খাবার দিয়ে গেল। একটি কথাও সে বলল না, বলবার ক্ষমতা হয়তো তার ছিলও না। তবে লক্ষ করেছিলাম, তার যেন কোনো নিকট আত্মীয়দের বিয়োগ হয়েছে, নতুবা বার বার চোখে জল আসছে আর মুছে ফেলছে কেন? যদি সে অবস্থা আমাদের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে হত তবে কী দুর্দশাই না প্রত্যক্ষ করতে হত! বিকালে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদের মুখ গম্ভীর, কালোপানা। বিপদ যাদের মাথার উপর, মৃত্যু যাদের দ্বারে হাজির, তাদের মুখ থমথমে গম্ভীর হবে না তো হবে কার? কিন্তু বিদেশীর প্রতি, অসহায়ের প্রতি কর্তব্য, বিশেষ যে-বিদেশী বিনা কারণেই দেশের লোকের হাতে অপমানিত, প্রহৃত, তার প্রতি কি এদের কোনো কর্তব্য নাই? তার কি কোনো কর্তব্যই নাই? তার কি কিছু সাহায্য করবার দরকার নাই— অন্তত দেশের জাতির সম্মান বজায় রাখবার জন্যও? চিনের লোকের সে ধারণা বেশ আছে। যদিও বিদেশীরা চিনাদের সাহায্যে চিনদেশ ভ্রমণ করে চিনের বদনাম প্রচারেই পঞ্চমুখ হয় তবু চিনাদের সহজাত অতিথিসৎকার-প্রবৃত্তিতে কোনো রকমেই সংকীর্ণতার ছোঁয়া লাগে না। আমার এই উপায়হীন অবস্থায় যখনই একজন চিনা এসে আমার প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে ধরেছে, তখনই তাদের অন্তহীন কর্তব্যনিষ্ঠা আমার অন্তরের দুঃখজ্বালা, শরীরের ব্যথাবেদনা সবই ভুলিয়ে দিয়েছে। মুহূর্তে স্বর্গ যেন নেমে আসত ধরায়। আমি সব ভুলে গিয়ে ভাবতাম— এই চিনাদের সম্বন্ধে কত বদনামই না শুনেছি, কত অপধারণাই না পোষণ করেছি, কত ঝালই না পরের মুখে খেয়েছি, অথচ এই চিনারাই এখন আমাকে নিতান্ত আপনজনের মতো চিকিৎসা করছে, সেবা করছে। তা ছাড়াও এই বিদেশীর প্রতি

তাদের প্রাণের তারে যে করুণা-স্পন্দন জেগে উঠেছে, তার তরঙ্গ, তার প্রেরণা আমার প্রাণেও কি থেকে থেকে পুলক-শিহরনে বেজে উঠছে না? বুঝেছিলাম বলেই আজ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা বলছি। যদি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত তবে চিনাদের সকল শুশ্রূষা আজ পণ্ড হয়ে যেত, আমারই মুখ হতে অন্য কথা বের হয়ে আসত!...

শরীর ভালো হয়ে গিয়েছে। দেহে এসেছে নূতন বল, প্রাণের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি তবুও ছিংছাং আদেশ দিলেন— দ্বিচক্রযানে অন্ততপক্ষে আরও দু-মাস চলা হবে না, যদি চলি তবে বেঁচে উঠতে পারব কি না সন্দেহ। কবিরাজের কথা মাথায় নিয়ে চিন সাগরে না গিয়ে আবার চললাম ইয়াংসি নদীতে তরী ভাসিয়ে আপনা হারিয়ে, সব যেন বিলিয়ে দিয়ে!

দিন ঠিক হল, নৌকা ভাড়া করা হল, গ্রামের লোক একদিন এক সূর্যালোকিত প্রভাতে আমাকে বিদায় দিতে এল। সকলের অগ্রে এলেন বৃদ্ধ কবিরাজ আর শুশ্রূষাকারী যুবকটি। যুবক-বন্ধু আমার সঙ্গে সাংহাই যাবে আমারই তত্ত্বাবধান করতে। তবু কিন্তু সে জানে না আমার ভাষা, বোঝে না আমার একটা কথাও— তাতে কি এসে যায় বন্ধুটির কাছে, সে-ই নিয়ে যাবে আমাকে সাংহাই, তাকে নিরস্ত করে কার সাধ্য! বিদায় নেওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি বিদায়ের অগ্রদূত। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী— সবাই সজল নয়নে নৌকার কাছে এসে নজর বুলাচ্ছে আমার উপর, তাদের বাষ্পাকুল ভঙ্গিটি যেন বলছে, ক্ষমা করো আমাদের দেশের সেই পাগলা সৈনিকদের, তাদের হয়ে আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

বিদায় বেলায় কবিরাজ বললেন, "কিন্তু কারো কাছে ব'লো না এই কষ্টের কাহিনি, চিনের শত্রু আজ চারিদিকে তো আছেই, আপন ঘরের ভিতরও রয়েছে প্রচুর। এই সুযোগে যদি আবার কেহ আমাদের সভ্য করতে আসে তবে দায়ী হবে তুমি। ভুলতে পারবে কি?" হাতজোড় করে ভগবানের নাম নিয়ে আত্মমর্যাদাকে মাত্র সাক্ষী রেখে বলেছিলাম, "একথা কোনো বিদেশীর কাছে বলব না, বলব গিয়ে দেশের লোকের কাছে যাতে তোমাদের দয়া, তোমাদের ভালোবাসার মর্ম তারা চিনতে শেখে। আর বলব গিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে চিনের লোকের অন্তরের বাণী, তারা সত্যই ভারতের স্বর্ণযুগের নর-নারীর দোসর, যদিও দেহের রং এবং খাদ্যে তাদের হয়ে পড়েছে অনেক প্রভেদ।"

নৌকা ছেড়ে দিল। আমরা দুটি জীব নৌকায় বসে, দুজনাই দুজনার কাছে ভাষাহীন, তবে কী কথা বলব বলুন তো? কিন্তু জিহ্বা আমাদের মূক হলেও প্রাণ তো শুষ্ক নয়! বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় যাদের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ, তাদের কাছে ভাষা শুধু নিরর্থকই নয়, মিলনের অন্তরায়ও বটে। আমাদের বিকালবেলা কাটল বেশ, তারপর এল সন্ধ্যা, সমভাবেই চলল আমাদের নীরব আকুতির আদানপ্রদান। মুক্ত নদীর জলে গাঢ় অমানিশার আঁধার পড়ে ঘনিয়েছিল। চিনদেশে যে পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের বাস তা যেন ভুলতে বসেছিলাম। কতক্ষণ পরে একটা বাতি দেখা গেল। ওই বাতি ব্রিটিশ জাহাজের। এখানে একটা ছোট স্টেশনও ছিল। জাহাজ তীরে লাগল না, আমাদের উঠতে হল সিঁড়ি বেয়ে। বুকে বড় আঘাত লাগল ওই সিঁড়িগুলি বেয়ে উঠতে। আমার সঙ্গী যুবক জাহাজে আমার সাইকেল এবং পিঠের ঝোলাটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আগে কেরানির সঙ্গে কথা বলল। কেরানি আমাদের কামরা দেখিয়ে দিলেন। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছিল, কিন্তু চিনা যুবকের পরিচর্যায় অল্প সময়ের ভিতরেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। রাত্রি কাটল, দিন এল। নদীর এপার ওপার দেখা গেল কিন্তু নদীতে নৌকা নাই, নদীতীরে ফেলে পালিয়েছে। জাপানি গানবোটগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে— নোঙর করে আছে। ওই গানবোটগুলিকে দেখে যত চিনা যাত্রীর মুখে বিদ্বেষের ছাপ ফুটে উঠেছিল— ওরা বিষনজর ঢেলে দিচ্ছিল, যেন ওগুলিকে ভস্ম করে ফেলতে চায়। বাইরে চুপচাপ বসে থাকা আর আমার ভালো লাগল না। নির্বাক সঙ্গীর সঙ্গে আকার-ইঙ্গিতে কথা হতে লাগল। এরই মাঝে কতকগুলি 'কোড' করে নিলাম, কাজ চলে গেল বেশ। হিন্দুর সঙ্গী নির্বাক চিনা তরুণ, পরিচয় শুধু আত্মিক, হৃদয়ে হৃদয়ে।

এর পরও আমি দীর্ঘদিন চিনদেশে ছিলাম। ক্রমে ক্রমে সাংহাই পিকিন প্রভৃতি ঘুরে কোরিয়ায় যাই।

মহাচিন হতে বিদায়— চিরবিদায় কি না বলতে পারি না, তবে চিনের লোকের সাহায্য প্রচুর পেয়েছি, অত্যাচারিত হয়েছি, চিনকে ভালোও বেসেছি— বুঝতে পেরেছি— পৃথিবীতে যদি কেউ ভারতের মিত্র থাকে, তবে সে এই চিন। চিন চিরদিনই ভারতের মিত্র থাকবে। ❑

[রামনাথ বিশ্বাসের "পৃথিবীর পথে" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মহাচীন' অংশটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল মূল রচনা অবিকৃত রেখে। তবে পুরনো বানান পরিবর্তিত।— সম্পাদক]

স্মৃতি-কণা

গোপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শ্রীমৎ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজের দুটি উপদেশ আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

এক : আমি ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অরুণাচল প্রদেশের অর্থাৎ তৎকালীন নেফা-র (নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি) সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে শিলঙে চাকরি পাই। ওইবছর মে মাসের এক সন্ধ্যায় স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজকে প্রণাম করতে শিলঙে লাইটুমুখ্‌রা স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে-সময় কক্ষে তিনি একাই ছিলেন। আমার মনে এক দ্বন্দ্ব থেকে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "মহারাজ, আমি বর্তমানে সরকারি চাকরি পেয়েছি। কাজ করে দিলে লোকে যদি আমাকে আট আনা (পঞ্চাশ পয়সা), এক টাকা বা দুই টাকা দেয়, তাহলে আমি নেব কি না।" জবাব দিতে গিয়ে তিনি একটু উষ্মা প্রকাশ করলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, "অফিসে যাও কেন?" উত্তরে আমি অতি নম্র কণ্ঠে বললাম, "চাকরি করার জন্য।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "চাকরি কেন কর?" বললাম, "বেতন পাওয়ার জন্য।" আবার প্রশ্ন করলেন, "বেতন কেন দেয়?" আমার জবাব, "কাজের জন্য।" তখন তিনি বললেন, "কাজের জন্য সরকারের কাছ থেকে পয়সা পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে অন্যের কাছ থেকে পয়সা কেন নেবে?" তখন বুঝলাম যে এটা অন্যায় কাজ।

দুই : আর-একদিন পূজনীয় মহারাজের ঘরে গিয়েছিলাম। সেদিনও তিনি একা ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন তাঁর কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করতে। বার বার জিজ্ঞাসা করার পর বললাম, করেছি। পূজনীয় মহারাজ তখন বললেন, রোজ পাঁচ মিনিট ঠাকুরের (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের) বই কিংবা স্বামীজির (বিবেকানন্দের) বই পড়বে।

উপরোক্ত দুটি উপদেশ পালন আমার জীবন গঠনে খুবই সাহায্য করেছে। বর্তমানেও এই দুই উপদেশের ফল কল্পনাতীত ভাবে আমার মনে আনন্দের সঞ্চার করে। ❑

আমার জীবনের আলোকবর্তিকা

রমানাথ ভট্টাচার্য

(এক)
ব্যক্তি পদ্মনাথ সম্পর্কে দু-চার কথা

প্রধানত আমাদের বংশের বা বৃহত্তর পরিবারের ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ব্যক্তি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে যে-সব কথা আমি জানতে পেরেছি সেই বিবরণই লিপিবদ্ধ করছি এই নিবন্ধে।

১৯৩৮ সালে পদ্মনাথ ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁর পুত্র ডা. পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য ও বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে বিদ্যাবিনোদের পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেন। বেলকাঠ খোদাই করে পদ্মনাথের প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। বানিয়াচং গ্রামের সমস্ত লোকজন তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। লুচি, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, আলুর দম ও দই-মিষ্টি পরিবেশন করে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শ্রীহট্ট জেলার বিশিষ্ট পণ্ডিত-সম্মেলন হয়েছিল।

বারবেলাতে বাইরে থেকে আগত কোনো ব্যক্তিকে পদ্মনাথ বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে শনিপূজা হত। পূজা-শেষে পুরোহিত কাঁসর-ঘণ্টা বাজালে পাড়ার লোকজন এসে সমবেত হত ও প্রসাদ পেত। শনিপূজা বলে তিনি কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না।

পাড়া বেড়ানো তাঁর স্বভাব ছিল। সেকালে কোনো-কোনো বাড়িতে একটি মাটির পাত্রে তুষ জ্বালিয়ে অগ্নিসংরক্ষণ করা হত এবং আম-কাঁঠালের দিনে নিবু-নিবু আগুনে সেই পাত্রটিতে তাঁর কোনো কোনো বউদি কাঁঠাল বিচি পুড়িয়ে নিজেরা খেতেন, বাচ্চাদেরও খেতে দিতেন। নিবু-নিবু আগুনে কাঁঠাল-বিচি পোড়ানোর দৃশ্য দেখে পদ্মনাথ ওইসব বউদিদের উদ্দেশে ঠাট্টা করে বলতেন, কিবা আগুনের আগুন— তার মাঝে আবার কাঁঠাল-বিচি ভাজা।

পদ্মনাথ স্বল্পভাষী ছিলেন। সাধারণত আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে মান্য চলিত ভাষায় কথা চলতেন। কথা বলতে তোতলাতেন।

তাঁর বাসভবনে পদ্মনাথ চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। চতুষ্পাঠীতে বানিয়াচঙের বাইরের লোকজনও পড়াশোনা করত। চতুষ্পাঠীর প্রধান পণ্ডিতের উপাধি ছিল সাংখ্যতীর্থ।

পদ্মনাথ গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়িতে তিনি মেয়েদের চটি পরা পছন্দ করতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্ত্রী সহ বাড়িতে এসে ঢুকছেন, সে-মুহূর্তেই তিনি ভেতর-বাড়ি থেকে বলে উঠলেন, "বউকে বলো স্যান্ডেল ছেড়ে বাড়িতে ঢুকতে।"

ময়মনসিংহ জেলার যশোদলে ছিল আমাদের কুলগুরুদের বাড়ি। পদ্মনাথের সময়ের কুলগুরু তাঁর জিনিসপত্র সহ বাড়িতে এসে ঢুকছেন দেখে তিনি রাগত স্বরে বললেন, "আপনি আসার আগে খবর দেবেন, লোক পাঠানো হবে আপনার দ্রব্যাদি বয়ে আনার জন্য।" কুলগুরু নিজে তাঁর জিনিসপত্র বয়ে আনবেন এটা পদ্মনাথ পছন্দ করতেন না। কুলগুরুর প্রতি ছিল তাঁর অশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ।

পদ্মনাথ পূতপবিত্র মনে দেবার্চনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাবিনোদের এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর গুয়াহাটির বাসস্থানে থেকে পড়াশোনা করতেন। পদ্মনাথের নির্দেশমতো ভোর চারটেয় স্নান করে তাঁকে ফুল তুলতে হত পূজার জন্য।

পদ্মনাথ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর আগে বানিয়াচঙে মহামারির আকারে কলেরা রোগ দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যেই পাচকের রান্না করা মুগ ডালের সঙ্গে কুড়ি পঁচিশটা পোস্তর বড়া খেয়েছিলেন। পরিণামে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করেন।

পদ্মনাথ দুর্গাপূজা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, দন্তহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা সংস্কৃতে রচিত পূজার মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। বিদ্যাবিনোদের মত ছিল, শাস্ত্রসম্মতভাবে দেবীর পূজা সম্পন্ন না-হলে তাঁর কোপানলে পড়ে পূজার উদ্যোক্তা নির্বংশ হতে পারে। দন্তহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে না বলে যে-কোনো পূজাই তাঁদের দ্বারা করানো ঠিক নয় বলে পদ্মনাথ মনে করতেন।

পদ্মনাথ এমনিতে খুব স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীপুত্র নিয়ে অতি ব্যস্ত লোকজন তিনি অপছন্দ করতেন। ছেলেমেয়েকে কোলে-কাঁধে করে পাড়া বেড়ানো তাঁর ভালো লাগত না। তিনি স্নেহমমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংযমশাসিত লোকজন ভালোবাসতেন।

পদ্মনাথ পূতপবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাড়ির বাইরে গ্রামে কোথাও বেড়াতে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে পরিহিত বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

তাঁর বাড়িতে একবার কুমারী পূজা হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি নাতনি রানিকে কুমারী নির্বাচন করে তিনি পূজা করেছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পরে ১৯৩৫ সালে কাশী থেকে প্রত্যাগত পদ্মনাথ যখন শরিকি বাড়িতে গৃহ নির্মাণ করছিলেন সে-সময়ে তাঁর অংশের সীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ দুজন জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে তিনি শরিকি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। আদালতের রায় পদ্মনাথের অনুকূলে বেরিয়েছিল।

তাঁর পুত্র বিরূপাক্ষ ও তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথ (আমার জ্যাঠামহাশয়) ঢাকায় ডাক্তারি পড়তে গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা দুজনই প্রায়শ বাইজি-নাচ দেখতেন। তাঁদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি ঢাকায় গেলেন। সেখানে যাওয়ার পরে তিনি স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন ছেলে ও ভাইপো মিলে বাইজি-নাচ দেখছেন। এই অধঃপতনের দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

গ্রামের মার্কসবাদী যুবকেরা পদ্মনাথকে পছন্দ করত না। তিনি পূজা-আহ্নিক নিয়ে থাকতেন, সে-জন্য তারা তাঁকে অপছন্দ করত।

দ্বিতীয় পুত্র বিরূপাক্ষ কলকাতায় হোস্টেলে থেকে আই.এ. পড়ছিলেন। একদিন পুত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তাঁর হোস্টেলে উপস্থিত হলেন পদ্মনাথ। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, পুত্রের বসবাস করার ঘরটি হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে সাজানো। বিচক্ষণ পদ্মনাথ বুঝতে পারলেন যে পুত্র লেখাপড়ার চেয়ে গান-বাজনার প্রতিই বেশি অনুরক্ত। তৎক্ষণাৎ তাঁর পড়াশোনা বন্ধ করে দেন তিনি।

পদ্মনাথ অতি শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। তিনি কাশীতে থাকাকালীন পুত্র বা জামাতারা তাঁর বাসস্থানে বেড়াতে গেলে ময়লা জামাকাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে বাড়িতে দিয়ে যাওয়ার পর ঘুণাক্ষরে তিনি জানতে পারলে সেইসব জামাকাপড় চৌবাচ্চার জলে আবার ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হত।

ফেন ঝরাতে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি ভেঙে গেলে স্ত্রী হাহুতাশ করলে পদ্মনাথ গিন্নিকে ধমক দিতেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি রূপে একবার গুয়াহাটি এলে পদ্মনাথের বাসভবনে রাত্রিবাস করেন। এবং রাতভর দুজনে সাহিত্যবিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। বিদায় নেবার সময়ে কবিশেখর তাঁকে বলেছিলেন, আপনার কাছ থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করলাম, আপনাকে আমার প্রণাম।

আমি একদিন কবি নীলমণি ফুকনের বাড়িতে গেলে গল্পচ্ছলে তিনি আমাকে বলেন, পদ্মনাথের গুয়াহাটি বাসায় সাহেবেরা এলে তিনি নিজ হাতে জগে চা ঢেলে দিতেন— এভাবেই তিনি তাঁদের চা খাওয়াতেন। অন্য একদিন বিকেলবেলায় মালিগাঁও থেকে বাসে পাশাপাশি বসে আমি ও নীলমণি ফুকন যাচ্ছি উজানবাজারের দিকে; বাস শুক্লেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে এলেই তিনি আমাকে বললেন, রাস্তার ওপাশে তাঁর সময়ের কোনো এক বাড়িতে পদ্মনাথ থাকতেন।

কথিত আছে, রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়ে নিজের দৈহিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্য পদ্মনাথ শুষ্ক গোময় প্যাকেট-বন্দি করে তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে রাখতেন।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে-সব তথ্য আমি জ্ঞাত হয়েছি সেগুলি জেনেছি, কবি নীলমণি ফুকন ছাড়াও, স্বর্গত পিতৃদেব রমণীমোহন ভট্টাচার্য, স্বর্গত অগ্রজ জ্ঞাতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতাবাসী অগ্রজ জ্ঞাতি শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শিলচরনিবাসী অগ্রজ জ্ঞাতি দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। এ-সব তথ্য পরিবেশন করতে পারার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি অবনত শিরে অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

(দুই)
স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ

(ক)

রামকৃষ্ণ ভুবনের বিখ্যাত ভক্তিসংগীত রচয়িতা ও সুগায়ক তথা সুরকার স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে আমার জ্ঞাতি জ্যাঠামহাশয় ছিলেন। তিনি, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও আমার পিতৃদেব স্বর্গত রমণীমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন পরস্পর সপিণ্ড জ্ঞাতি। আর বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের পিতামহ ও আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের পিতামহ ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। আমাদের বংশে বা বৃহত্তর পরিবারে বনস্পতিস্বরূপ উচ্চশির এই তিন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন— তাঁদের বিস্তৃত ছায়াতলে দাঁড়িয়েই জীবনভর চলেছি পথ। তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি সাহিত্যের পথে চলার অশেষ প্রেরণা। তাঁদের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যেই আমার নামে গঠিত ফাউন্ডেশন প্রতি বছর দিচ্ছে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার তথা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার। আর গুয়াহাটিতেই গত চার বছর ধরে এই দুটি স্মৃতি পুরস্কারের অনুষ্ঠান হচ্ছে মহাপুরুষ শংকরদেব বা মহাপুরুষ মাধবদেবের রচিত 'বরগীত' এবং স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'শৌর্য দাও বীর্য দাও' ভক্তিসংগীতটি পরিবেশন করে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ সম্পর্কে আমার দু-চার কথা বলার আছে, সে-কারণেই এই ভূমিকার অবতারণা।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত বানিয়াচং গ্রামের বিদ্যাভূষণপাড়ায় পাশাপাশি অবস্থিত ছিল চণ্ডিকানন্দ মহারাজ (প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে যাঁর নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) তথা রামনাথ বিশ্বাস আর আমাদের বসতবাড়ি দুটি। দুটিই ছিল শরিকি বাড়ি। চণ্ডিকানন্দের বাবা ও রামনাথের কাকা ছিলেন রায়সাহেব গিরিজা বিশ্বাস। তাঁদের বাড়িটি রায়সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। আর আমাদের শরিকি বাড়িটি জানকী ডাক্তারের বাড়ি— এইনামে পরিচিত ছিল (জানকী ডাক্তার ছিলেন আমার পিতামহ)। তাঁদের ও আমাদের বাড়ির মধ্যিখানে একটি গোপাট ছিল। বর্ষাকালে সেটি জলমগ্ন হয়ে যেত। সে-কারণে বৃষ্টির দিনে পাড়ার লোকজনের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুটি বাড়ির মাঝখানে একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া হত। সাঁকোটি নির্মিত হত সুপুরি গাছের একটি দীর্ঘ কাণ্ড দিয়ে। ১৯৩৫-৩৬ সালে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নবনির্মিত বাসভবনের পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে সাঁকোটি শুরু হয়ে রায়সাহেবের বাড়ির উত্তর-পূর্বাংশে তা শেষ হত। মান্ধাতার আমল থেকে এই স্থানেই সাঁকোটি নির্মিত হয়ে আসছিল।

বিদ্যাভূষণপাড়াবাসী চণ্ডিকানন্দের পিতৃদেব গিরিজা বিশ্বাস ছিলেন প্রচুর জমিজমার মালিক তথা কসবা বানিয়াচঙের বিখ্যাত ব্যক্তি। এই গ্রামে তিনিই 'ভিলেজ কোর্ট' চালু করেন।

চণ্ডিকানন্দের মা সৌদামিনী দেবী বানিয়াচং-গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত উদ্যমে ও স্বামী গিরিজা বিশ্বাসের অশেষ সহযোগিতায় তাঁদের শরিকি বাড়িতে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো পড়তই, অন্যান্য পাড়ার মেয়েরাও এসে পড়াশোনা করত। অন্যান্য পাড়া থেকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য দু-তিন জন বেতনভোগী ঝি-ও নিযুক্ত করা হয়েছিল। (এ আমার স্বচক্ষে দেখা।) সেই বিদ্যালয়টি প্রধানত সৌদামিনী দেবী একাই চালাতেন, তবে খুকু দেবী নামে অন্য একজন মহিলাও সেই স্কুলটির সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন।

সৌদামিনী দেবী ছিলেন গোলগাল চেহারার অধিকারী শ্যামবর্ণা মহিলা। অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। পাড়ার নাতি-নাতনিরা দস্তুরমতো তাঁকে ভয় করত— দেখত অতি সমীহের চোখে। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল আলতা-রাঙা। একদিনের কথা মনে পড়ছে। দিদি মহামায়ার কোলে বসে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি, আমাকে দেখে তিনি অতি খুশি হয়েছিলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল খুশির সাদাজবা।

রায়সাহেবের শরিকি বাড়িতে পুরুষানুক্রমে হত দুর্গাপূজা— ছিল বিশাল নাটমন্দির। নাটমন্দিরটির উত্তরাংশ ছিল দু-তিন ফুট উঁচু, সত্তর-আশি ফুট দীর্ঘ ও বার-চোদ্দ ফুট প্রস্থ। বছরে-বছরে সেই স্থানটির মধ্যে বসানো হত সপরিবারে দুর্গাপ্রতিমা। পূজার দিনগুলিতে লোকজন, আত্মীয়স্বজন বসার জন্য নাটমন্দিরটিতে পেতে দেওয়া হত প্রচুর বেঞ্চি। বিদ্যাভূষণপাড়া ছাড়াও অন্যান্য পাড়ায় ছড়ানো আমাদের জ্ঞাতিবর্গ ও গ্রামের অগণন লোক মহামোদে উপভোগ করতেন সে-বাড়ির পূজা। পূজার তিন-চারদিন আমাদের সমূহ জ্ঞাতি মধ্যাহ্নভোজন করতেন রায়সাহেবের বাড়িতেই।

জীবনে চণ্ডিকানন্দকে দেখেছি তিনবার। একবার বাল্যবয়সে, একবার কৈশোরে, অন্যবার ভরযৌবনে। বাল্যে এক সকালবেলা তাঁকে দেখেছি তাঁদের বাড়ির নাটমন্দিরের পাশে— বাড়ির পূর্বাংশে। তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখছিলেন গাছ-গাছালিতে ভরা তাঁদের বর্হিবাটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সেই মুহূর্তে তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী এসে বললেন, "আসুন মহারাজ, চা হয়ে গেছে।" তখন তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সুপুরুষ সন্ন্যাসী, তপ্ত কাঞ্চনের মতো ছিল তাঁর গায়ের রং।

দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখেছি নিলামবাজারস্থিত বিপিনচন্দ্র হাইস্কুলে। তখন আমি সেই স্কুলের ছাত্র (স্থানটি সদর শহর করিমগঞ্জ থেকে দশ-বারো মাইল ভেতরে)। সে-সময়ে তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, চোখে-মুখে ছিল দিব্যজ্যোতি, কাঁচা-পাকা দাঁড়িতে আবৃত ছিল মুখ। তিনি এলে স্কুলে সভা বসে। "সেই সভায় তাঁর 'শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও' গানটি তাঁরই ললিত-মধুর জলদগম্ভীর কণ্ঠে গীত হতে শুনেছিলাম। তাঁর এই গানটি আমার খুবই প্রিয়। প্রায় সময়ই এই গানটি গেয়ে থাকি।" (নির্বাচিত কবিতা/ রমানাথ ভট্টাচার্য পৃ. ২০১, মানিক দাসের নেওয়া সাক্ষাৎকার।)

তৃতীয়বার ১৯৭৯-র ডিসেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে তাঁকে দেখেছি বেলুড় মঠে। দেখেছি বললে ভুল হবে— তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তখন তিনি গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আসছিলেন আশ্রমে। তাঁর আবাসের গেটে, শ্যালক-শ্মশ্রুমাতা ও স্ত্রী-পুত্র সহ দেখা করি তাঁর সঙ্গে। আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের নাম করে তাঁকে আমার পরিচয় দিই। তিনি আমাকে বিলক্ষণ চিনতে পারলেন। বললেন, "দীর্ঘদিন পরে এই নাম শুনলাম।" তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, "মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছ?" আমার না-বোধক উত্তর শুনে বললেন— "তাহলে তোমার সঙ্গে আর কথা চলে না।" এই বলে ধীরে-ধীরে গেট অতিক্রম করে বাসভবনে ঢুকে গেলেন। তখন আমি নবীন যুবক, তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ, চোখে-মুখে ছিল না পূর্বেকার দিব্যজ্যোতি। হায়! সাধুসন্ত, সাধারণ মানুষ সবাই জরাদাস-জরাগ্রস্ত হন।

আমার বিশ্বাস, রায়সাহেবের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ব্রহ্মচর্য তথা সন্ন্যাস-অবলম্বনের প্রেক্ষিতে একটি মর্মান্তিক পারিবারিক ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। আমার মা স্বর্গতা কিরণপ্রভা ভট্টাচার্য সেই ঘটনাটি বিশদভাবে আমাকে বলেছিলেন। সে অতি করুণ— অতি-অতি বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিল এই নিবন্ধের প্রথমাংশে বর্ণিত গোপাটটির জবরদখল নিয়ে। সে-কথাই বলছি। আমাদের পাড়ার (বিদ্যাভূষণপাড়া) পূর্বাংশে ছিল দুটি পুকুর। দক্ষিণাংশের পুকুরটি ছিল রায়সাহেবের বাড়ির— উত্তরাংশের বিরাট পুকুরটি ছিল আমাদের সহ অন্যান্য শরিকের। রায়সাহেবের বাড়ির পুকুরটির বিস্তৃত উত্তরপার ও পূর্বপারের শিবমন্দির-ঘেঁষা উত্তরাংশ অতিক্রম করার পরে ছিল একটি পায়ে হাঁটা পথ। সেই পথটির ঈষৎ ছিল পূর্বমুখী, তারপর সেটি কিছুদূর পর্যন্ত ছিল উত্তরমুখী, তারপরে আবার ঈষৎ পূর্বমুখী হয়ে সেটি মিলেছিল বিশাল সরকারি পুকুরের পশ্চিম-দক্ষিণ পারের প্রায়-মিলনস্থলে। সরকারি পুকুরটির পুবপারে বাস করত কয়েক ঘর ইসলামধর্মী লোক। তারা সরকারি পুকুরটির দক্ষিণ-পার ধরে আমার বর্ণিত পায়ে-হাঁটা পথটি অতিক্রম করে রায়সাহেবের বাড়ির উত্তর-পূর্ব পুকুর-পার দিয়ে পাড়ার মধ্যস্থিত গোপাটটি ধরে তাদের গবাদি পশু চরাতে নিয়ে যেত পাড়াটির পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ মাঠে। সরকারি পুকুরের পশ্চিম-পারের লোকজন তাঁদের বাড়ির পুকুরপার গোপাট রূপে ব্যবহার করছে দেখে রায়সাহেব গিরিজা বিশ্বাস আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তিটা ওইসব লোকজন মেনে নিতে পারেনি। ফলে রায়সাহেব ও তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তারা গোপনে রায়সাহেবকে হত্যার চক্রান্ত করে এবং সেই পাপকর্মটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেয় সরকারি পুকুরের পুব-পারের বাসিন্দা ছবু মিয়ার বাবা। লোকটি ছিল রায়সাহেবের অনুগত ভৃত্য তথা প্রজা।

এখন বলছি কী উপায় অবলম্বন করে রায়সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল ছবু মিয়ার বাবা— সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। এক শীতের সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে তার চাদরের ভেতরে একটি ধারালো দা একহাতে লুকিয়ে রেখে সে উপস্থিত হল দেওয়ানজির (আমাদের পাড়ার উত্তরাংশে বসবাসকারী আবু চক্রবর্তী ও যতীন্দ্র চক্রবর্তীর বাবা) সঙ্গে আড্ডারত রায়সাহেবের নিকট। তাঁকে সে বলল, "সাহেব, বাড়িতে লোক এসেছে, চলুন।" সেই খবর পেয়ে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা বন্ধ করে তিনি রওনা দিলেন বাড়ির দিকে— তাঁর পেছনে-পেছনে ছিল ছবু মিয়ার বাবা। রায়সাহেবের বাড়ির পুকুরটির উত্তরপার যেখানে এসে মিলিত হয়েছে আমাদের পাড়ার ভেতরকার গোপাটটির সঙ্গে, সেখানে পৌঁছনো মাত্রই সে চাদরের ভেতরে লুকোনো ধারালো দা বের করে তাঁকে বত্রিশবার কোপাঘাত করল। অতি-অতি বেদনাকাতর

হয়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁর চিৎকার শুনে ঈষৎ দূরে আমাদের পুকুরে রোগী দেখে এসে অবেলায় স্নানরত আমার ঠাকুরদা ডাক্তার জানকীনাথ তড়িৎগতিতে সেখানে লোটা হাতে উপস্থিত হলেন এবং লোটার আঘাতে সেই জিঘাংসুকে তাড়িয়ে দিয়ে অগ্রজ জ্ঞাতির প্রাণ-রক্ষা করলেন। রক্তস্রোতে প্লাবিত পিতৃদেহ দেখে ক্রোধে অন্ধ পুত্র জিতেন্দ্রনাথ (ভবিষ্যতের স্বামী চণ্ডিকানন্দ) আত্মরক্ষার জন্য বাড়ির গোপন স্থানে রাখা অস্ত্রশস্ত্র থেকে একটি বর্শা হাতে তুলে নিলেন এবং দৌড়ে গেলেন পিতৃ-জিঘাংসু ছবু মিয়ার বাবার সন্ধানে আর তাকে পেয়েও গেলেন তার বসতবাড়িতে। দেখা মাত্রই তাকে তিনি বর্শাবিদ্ধ করলেন— অস্ত্রটির ছুঁচলো ফলা তার পেট বিদ্ধ করে পিঠ অতিক্রম করল। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর বয়স ছিল ষোলো। (মতান্তরে তখন তিনি পাঠশালার ছাত্র এবং পিতাকে বধোদ্যত ছবু মিয়ার বাবাকে তিনি ছুরিকাঘাত করেছিলেন। পাঠশালায় পাঠরত একটি ছেলে সেই ভয়ংকর জিঘাংসুকে ছুরিকাঘাত করতে যাবে— এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।)

ছবু মিয়ার বাবার রায়সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা এবং অতি রাগান্বিত জিতেন্দ্রনাথের পালটা-আক্রমণ আর গোপাটটির অধিকার নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল। আদালতের রায় রায়সাহেবের অনুকূলে বেরোয়। ঘোরতর অপরাধকারী ছবু মিয়ার বাবার শাস্তি হয়েছিল চোদ্দ বছর দ্বীপান্তর বাস। জিতেন্দ্রনাথ তখন নাবালক ছিলেন, সে-কারণে তাঁর গুরুতর অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি হয়নি। (মতান্তরে একদিনের জন্য তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল।)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জিঘাংসু কর্তৃক পিতা গিরিজা বিশ্বাসের সর্বাঙ্গে কোপাঘাত ও কোপাহত দেহ থেকে প্রবাহিত রক্তস্রোত দেখে তথা প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতৃ জিঘাংসুকে জিতেন্দ্রনাথের গুরুতর বর্শাঘাত— এ দুটি মর্মান্তিক ঘটনা সংসার-জীবনের প্রতি তাঁকে প্রবলভাবে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। এই দুটি হৃদয়বিদারক স্মৃতি তাঁর মনে সতত অশান্তির আগুন জ্বালাত এবং তাঁকে বেদনাভারাক্রান্ত করে তুলত। সে-কারণে ১৯১৮ সালে শ্রীশ্রী সারদা দেবী ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে বেড়াতে এলে বি.এ. পাঠরত জিতেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্যও অবলম্বন করেন। পরবর্তীকালে যথাসময়ে রামকৃষ্ণ-ভুবনে সন্ন্যাস-অবলম্বন করেন।

তদানীন্তন ভারত সরকার রায়সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমার ছেলে জিতেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করলে তাঁকে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা হবে। পিতার মধুর স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হন।

সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরে সুচিকিৎসায় রায়সাহেব ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং শতবর্ষ আয়ুষ্কাল ভোগ করে মৃত্যুর কোলে চিরবিশ্রাম নেন। (আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, দিদি মহামায়ার কোলে বসে তাঁর বাড়ি থেকে অদূরেই দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর শ্মশান যাত্রার দৃশ্য।) তাঁর জীবদ্দশাতেই ছবু মিয়ার বাবার দ্বীপান্তর-বাসের সমাপ্তি হয়। বাড়ি ফিরে এসে সে রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, চলা-ফেরার জন্য তাঁকে রুপোর বাঁধানো হাতল-যুক্ত একটি লাঠি ও রাজকীয় ভোজনের জন্য একটি কচি হাঁস উপহার দেয়।

(খ)

"শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-সমস্ত সন্ন্যাসী কণ্ঠসঙ্গীতে ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত, শ্রীমৎ স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁহাদের অগ্রগণ্য।... রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের পর ... তাঁর আসল কর্ম শিশুজগতে বাস করিয়া মানুষ গড়া।" (উৎস : 'সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান', পৃ. ১৪২, লেখক কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য।)

তখন আমি শিলঙে কর্মরত ছিলাম। মনে হচ্ছে সময়টা ছিল ১৯৬৫-৬৬ সাল। সে-সময়ে স্বামী চণ্ডিকানন্দের লেখা 'মানুষ হও' নামের একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল শিলং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। বিজ্ঞপ্তিটি চোদ্দ-পনেরোটি ক্রমিক সংখ্যায় বেরোয়— প্রতিটি ক্রমিকেই তাঁর মানুষের প্রতি আন্তরিক আবেদন ছিল প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য। এটি পড়ে মানবতাবাদী আমি অতি-অতি চমৎকৃত হয়েছিলাম এবং মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম, একজন মানুষের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা কত জরুরি।

চণ্ডিকানন্দের সংগীতে ঐশী ভাবনা ছাড়াও যে-ভাবটি উজ্জ্বলতম রূপে ফুটে উঠেছে, সেটি হচ্ছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। মানুষের আত্মিক উন্নতির দিকটি বড় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর সংগীতে। স্বদেশভাবনা, স্বদেশপ্রেম তাঁর গানের অন্যতম বিষয়। তাঁর অনেকানেক গান একাধারে গান ও কবিতা। গানে কাব্যগুণের এমন সুমধুর সমন্বয় রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি, অতুলপ্রসাদ সেন ও নজরুল ইসলাম ব্যতিরেকে আর কারো গানে তেমন করে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর গান একাধারে গান ও গীতিকবিতা। যে-বিশিষ্ট সংগীত-রচয়িতা 'শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও'

ইত্যাকার প্রচুর গান রচনা করে বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি সাধারণ সংগীত-রচয়িতা নন— ঋষিপ্রতিম সংগীতস্রষ্টা। এর অতিরিক্ত চণ্ডিকানন্দের সংগীত বিষয়ে আমার লেখা সমীচীন মনে হয় না। স্বামী চণ্ডিকানন্দ সংগীত-জগতে একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। সুপণ্ডিত ড. সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় চণ্ডিকানন্দের সংগীত-ভুবনের নানা কথা লিপিবদ্ধ করছেন। অতএব সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি নীরব থাকা শ্রেয় ও প্রেয় মনে করি।

এখন অন্য দু-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি চণ্ডিকানন্দ সম্পর্কে আমার লেখাটি শেষ করছি। পারিবারিক সূত্রে সাহিত্য-জীবনে আমি যার-পর-নাই অনুপ্রেরণা পেয়েছি পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও স্বামী চণ্ডিকানন্দের মহত্তর জীবন যাপন থেকে। সে-কারণে অশেষ শ্রদ্ধাবশত এই ত্রয়ীকে নিয়ে রচনা করেছি কবিতা। কিন্তু আমি যেহেতু সাধন-জগতের লোক নই, সেহেতু চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম— এ বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কোনোমতেই আমার মনের ভাবটাকে ভাষা দিতে পারছিলাম না। অসহায় আমি কী উপায় উদ্ভাবন করে তাঁকে নিয়ে কবিতাটি লিখেছিলাম সে-কথাটাই এখন বলছি।

আমার বাসভবনে এক আসনে স্থাপিত আমার গুরুদেবের ফোটো, অন্য আসনে স্থাপিত রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দ ও আমার স্ত্রীর গুরু আত্মস্থানন্দজির ফোটো। তাঁদের ফোটো নিত্যদিন ভক্তিভরে পূজিত হয় বাসভবনটির একাংশে। আমি তো ভালো করে জানি স্বামী চণ্ডিকানন্দ শ্রীমার দীক্ষিত ছিলেন, সে-কারণে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সে-সময়ে একনাগাড়ে তিনদিন আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম— মা, চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার শক্তি আমাকে দাও। আশ্চর্য! তৃতীয় দিনের প্রার্থনার শেষে চণ্ডিকানন্দের ওপর কবিতাটি আমার কলম থেকে বেরিয়ে এল; সেই কবিতাটি শ্রীশ্রী সারদামণির দান বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাঁরই কৃপায় একজন সংসারী মানুষের পক্ষে সাধকোত্তম চণ্ডিকানন্দকে নিয়ে কবিতাটি লেখা সম্ভব হয়েছিল। কবিতাটি নীচে উদ্ধৃত হল (এটি আমার প্রকাশিতব্য অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'অন্য স্বর অন্য সুর'-এর অন্তর্ভুক্ত)—

জানি আমি মা সারদা খুব স্নেহ করতেন চণ্ডিকা তোমায়
আর তুমি ভক্তিভরে রেখে গেছ পাদপদ্মে তাঁর,
অনবদ্য অসামান্য সংগীত তোমার।
রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুধন্য গায়ক,
কিন্নরনিন্দিত কণ্ঠে গেয়ে গেছ গান।
মহান সংগীতকার তুমি রামকৃষ্ণ ভুবনে,
হে সন্ন্যাসী, অনুপম তোমার সংগীত,
তোমার অনন্য গান সুরতালে কী যে সুমধুর,
কানের ভিতরে যেন সুরধুনী-ধ্বনি।

"শৌর্য দাও বীর্য দাও"... "বীর সেনাপতি"
তোমার এ-সব গান অমৃতলহরি,
গীত হলে বৃষ্টি হয় দিব্য পৌরুষ,
এইসব গান শুনে মড়া ধরে সুর ধরে গান।
রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুমধুর সংগীতকার,
চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম,
চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম।

(২৬.৬.২০১৩)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভক্তিসংগীত তথা নানা ধরনের সংগীত রচনা করেছেন। শিশু-জগতে থেকে মানুষ গড়ার কাজটি ছাড়াও যখন যে-রামকৃষ্ণ মিশনে ও মঠে চণ্ডিকানন্দ থেকেছেন সেখানেই ভক্তিমূলক বা আত্মিক উন্নতির জন্য নানা ধরনের গানবাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। লোকজনকে রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য ওইসব গান শেখাতেন। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীনও তিনি মিশনের ভাবধারায় উজ্জীবিত করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে গান শেখাতেন। তাঁর মহিলাভক্ত ছিল প্রচুর। শোনা যায়, তাঁর অনেক মহিলাভক্ত থাকায় স্বামী সৌম্যানন্দ যখন শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি ছিলেন সে-সময়ে কোনো-কোনো মহারাজ তাঁর বিরুদ্ধে কামিনী-সংস্রবের অভিযোগ আনেন। সেই অভিযোগ শুনে নিদারুণ মর্মাহত চণ্ডিকানন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করার। পরিস্থিতি বিবেচনায় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ওখানে (বেলুড় মঠে) নিয়ে যান এবং সেখান থেকে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিশুমহলে বাস করে মানুষ গড়ার কাজে ও গানের মধ্য দিয়ে মিশনের ভাবধারা প্রচারের জন্য পুনর্নিয়োগ করা হয়। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধবয়সে তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনেন (বেলুড় মঠের) বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমাবাসে বিশ্রামের জন্য। সেখানেই আশি বর্ষাধিক বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। ❑

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩' সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে-দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ড্স কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই (২০১২) তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এইনদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এখন পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২ ০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুর ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং আজও তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এখন পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ। সাম্প্রতিকতম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মাণ্ডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট।

যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন সবই হয়ে ওঠে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন' ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী ভবেন বরুয়া

শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক ভবেন বরুয়ার জন্ম উজান অসমের শিবসাগর জেলায় যোরহাট মহকুমার অন্তর্গত জানজিতে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুআরি। দেবেন্দ্রনাথ ও কাঞ্চনবালা বরুয়ার সন্তান ভবেনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেন গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে, ১৯৫৬ সালে। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পান ভবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ভবেন বরুয়া অতিবাহিত করেছেন শিক্ষকতায়। যোরহাটে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যে-কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার শেষ হয় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। মাঝখানে তিনি পাতিয়ালার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-তেও কাজ করেছেন, ছয়ের দশকে তিনবছর ছিলেন আকাশবাণী, দিল্লির অসমিয়া সংবাদপাঠক।

ইংরেজির শিক্ষকতা করলেও ভবেন বরুয়ার অসমিয়া ভাষায় ছন্দের হাত চমৎকার। 'সোনালী জাহাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য লাভ করেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই গ্রন্থটিই তাঁকে এনে দেয় আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সাহিত্য সম্মান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'নতুন পৃথিবী' (বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠকালে প্রকাশিত), 'সোনালী জাহাজ', 'পোন্ধরটা কবিতা', 'বগা জুই কলা জুই আরু অন্যান্য কবিতা', 'অসমিয়া কবিতা : রূপান্তরর পর্ব', 'অসমিয়া কবিতা : বিবর্তনর পর্ব', 'প্রসঙ্গ : কবিতা', 'প্রসঙ্গ : বাণীকান্ত', 'প্রসঙ্গ : জ্যোতিপ্রসাদ', 'প্রসঙ্গ : ভবেন্দ্রনাথ', 'অসমর বৌদ্ধিক দুরবস্থার প্রসঙ্গত', 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া', 'সায়েন্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স'।

শিক্ষকতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভবেন বরুয়া বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সংলাপ' (অসমিয়া), 'আসাম কোয়ার্টারলি' (ইংরেজি), 'জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব গৌহাটি : আর্টস' (ইংরেজি), 'সুদর্শন' (ইংরেজি), 'নতুন পর্যায়র সংলাপ' (অসমিয়া)।

অসম তথা ভারতে ভবেন বরুয়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. সি. দেব শতবার্ষিকী বক্তৃতা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেইন্ট শংকরদেব, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব বৈষ্ণবিজ্‌ম', প্রথম আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্মারক বক্তৃতা, অসম সাহিত্য সভা আয়োজিত প্রথম আনন্দরাম বরুয়া স্মারক বক্তৃতা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মহেন্দ্র বরা স্মারক বক্তৃতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে 'ফ্রম ইমিটেশন টু ইমাজিনেশন' প্রভৃতি।

এ-ছাড়া ২০০৫ সালে সিপাঝাড়ে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৬৮তম অধিবেশনে কবিসম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। পূর্ব ইউরোপে আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় কবি হিসেবে ভবেন বরুয়াকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। সেবার তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘুরে আসেন।

ভবেন বরুয়ার পত্নী দীপা ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং চিত্রশিল্পে পারদর্শী। দুই পুত্র অঙ্কুর ও অর্পণ উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

জন্ম ১৯৫১ সালের ৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা পুরুষোত্তমপ্রসাদ দাশ, মা শেফালি দাশ। দুজনেই প্রয়াত। স্ত্রী শুক্লা দাশ।

শিক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল রাজ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)। কর্মজীবন শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিক মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। মধ্যে অল্প কিছুদিন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থায় যোগদান। প্রায় ২৮ বছর সাংবাদিকতার পর স্বেচ্ছা-অবসর। অতঃপর ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবির কাগজ কবিতার কাগজ' মাসিক 'কবিসম্মেলন'। সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখকদের সৃষ্টিশীল অবদানে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও সজীব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চির সবুজ লেখা' (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির মুখপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা' পত্রিকায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কবিতার নাম 'এই তো আমার পণ'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাগজকুচি', প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে।

ছোটদের কবিতায়ও শ্যামলকান্তির নিজস্বতা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। উপহার দিয়েছেন বেশকিছু অনবদ্য ছড়া। চমৎকার তাঁর ছন্দের জ্ঞান। বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাগজকুচি', 'প্রেমের কবিতা', 'ভূতের চরণে', 'আমাদের কবিজন্ম', 'সরল কবিতা', 'ছোট শহরের হাওয়া', 'দূর থেকে লিখি', 'বোকা মেয়ের জন্য', 'চলে যায় দিন', 'পুলকিত যামিনী', 'একলা পাগল', 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। বাংলাদেশেও শ্যামলকান্তির জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেখান থেকে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত কবিতা', 'বন্ধুর মুখোশে বন্ধু', 'ভেসে বেড়াবার আনন্দ', 'ঝুপসি দিদির গানের বাড়ি', 'প্রিয় ১০০ কবিতা', ও 'ধানী পটকা' (বড়দের ছড়া)।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাবুইবাবু', 'চাইছি ঘুড়ি মাঞ্জা সুতো', 'পাতায় মোড়া বাঁশি', 'পাখি সব করে রব', 'বাঘের গায়ে হলদে জামা', 'শ্রেষ্ঠ ছড়া' এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'আমপাতা জামপাতা' ও 'মনে কর ঘুমিয়ে আছিস'।

বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'কবিসম্মেলন' ছাড়াও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতীতি', 'জনপদ', 'কবিতা সংবাদ', 'কনসার্ট', 'আত্মজ' প্রভৃতি। সম্পাদিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। সম্পাদিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : 'হাজার কবির হাজার কবিতা', 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'লেখক সত্যজিৎ রায়', 'আহ্লাদে আটখানা', 'দুই বাংলার প্রাণের কবিতা', 'দুই বাংলার আবৃত্তির কবিতা', '১০০ ছড়া ১০০ ছবি', 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', 'চেনা সুনীল অচেনা সুনীল', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রভৃতি।

কবি ও কবিতা নিয়ে নানারকম কাজে শ্যামলকান্তি সর্বদাই অক্লান্ত। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'সৌহার্দ্য ৭০', 'সারা ভারত কবিতা উৎসব', 'বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব', 'সারা বাংলা শিশু সাহিত্য উৎসব', 'সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলন' প্রভৃতি।

অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত। তার মধ্যে রয়েছে : জীবনানন্দ পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, তুষার রায় পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সাধনা চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার, লেখক সম্প্রীতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, আনন্দ স্নোসেম পুরস্কার (শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণ' কবিতার জন্য), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (মালদহ), শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, ডা. ওয়াজেদ স্মৃতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), আনিকা ইউসুফজাই স্মৃতি পুরস্কার (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ), ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার (কোচবিহার, দু-বার, কবিতা ও সম্পাদনার জন্য), কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

২০০৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত 'জাতীয় কবি'র সম্মান, গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশের বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্যামলকান্তির একাধিক কবিতা।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

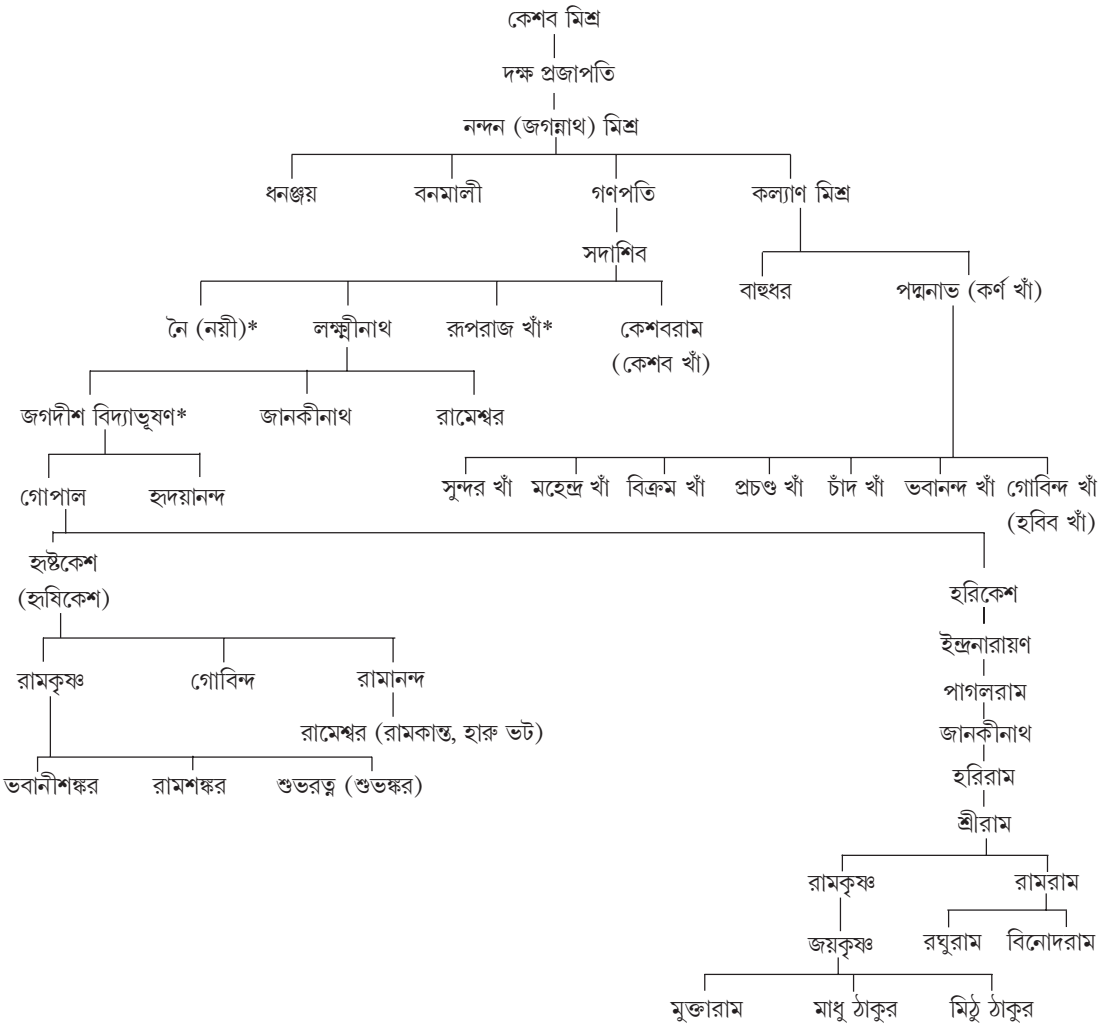

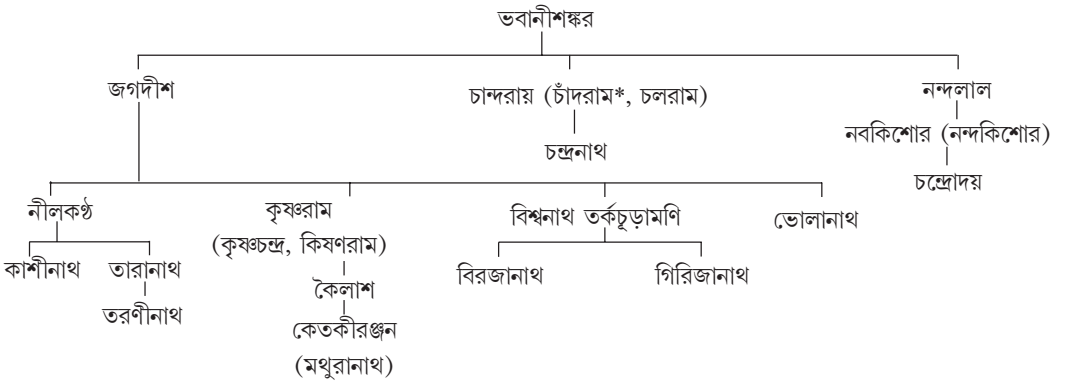
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

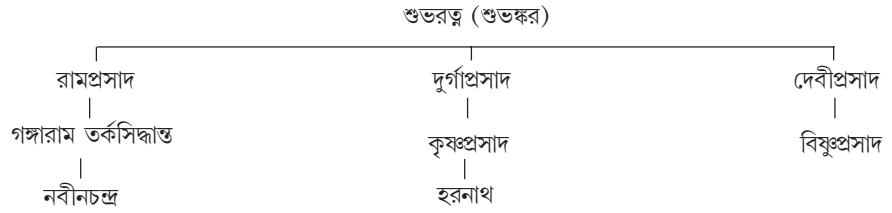
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

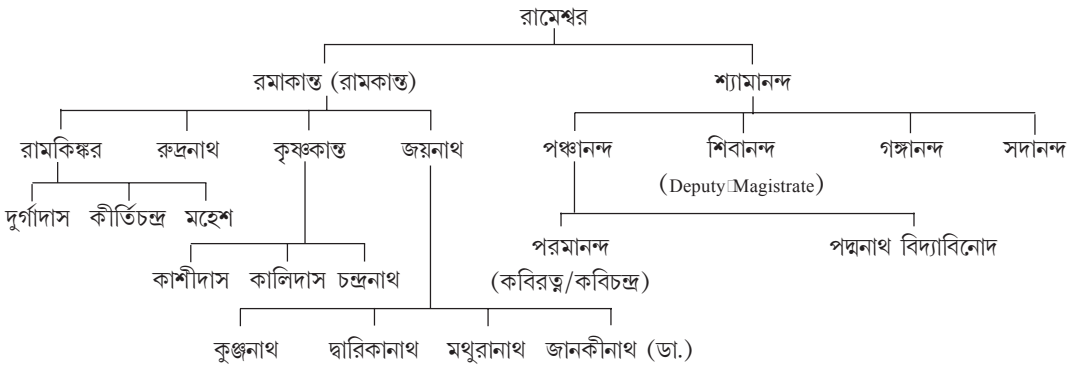
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

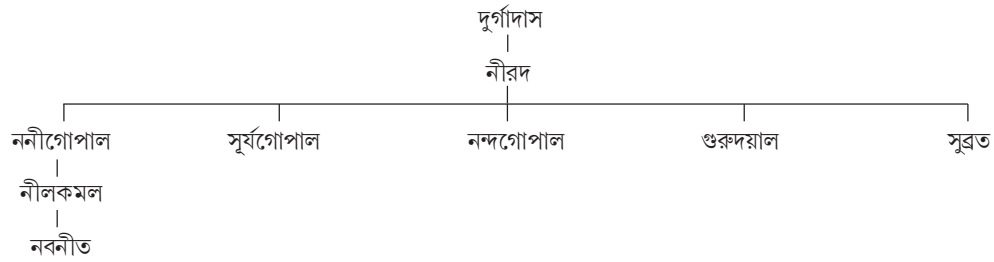
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

কীর্তিচন্দ্র
- দক্ষিণারঞ্জন
  - দ্বিজেন্দ্র
    - দীপক
    - অলক
      - দেবোপম
  - দীনেন্দ্র
  - দেবজ্যোতি
    - দেবাশিস
    - দিবাকর
      - পারিজাত
  - দিলীপ

জানকীনাথ (ডা.)
- রজনীনাথ
  - রমেন্দ্রনাথ
    - ঋতব্রত
      - সুদীপ্ত
    - শান্তনু (সন্ন্যাসী)
  - রণেন্দ্রনাথ
  - রঞ্জনকুমার
    - রাহুল
- রমণীমোহন
  - রণজিৎ
    - দেবাশিস
    - দেবজ্যোতি
    - দেবব্রত
  - রমানাথ
    - শ্যামাশিস
  - রণবীর
    - রঞ্জন
- হৃষীকেশ (কবিরাজ)
- কালীপদ

পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
- পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
  - পরমেশ
    - পুষ্পক
      - রৌণক
    - পল্লব
  - পরিতোষ
    - প্রদ্যোত
      - পরজ
    - প্রসূন
  - প্রিয়তোষ
    - প্রদীপ্ত
  - প্রাণতোষ
  - পঙ্কজ
  - পিনাকী
- প্রমোদচন্দ্র
  - প্রভাকর
  - প্রশান্ত
    - প্রদীপ্ত
  - প্রণব
    - প্রসূন
    - প্রদ্যোত
- প্রহ্লাদচন্দ্র
  - ফাল্গুনী
    - প্রমিত
  - পার্থসারথি
    - প্রিয়ব্রত
- পরেশচন্দ্র

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
- পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
  - শক্তিপ্রসাদ
    - কৃষ্ণেন্দু
    - শুভ্রেন্দু
- বিরূপাক্ষ
  - দেবীপ্রসাদ
    - নবারুণ
    - নীলাঞ্জন
    - সুমাল্য
  - রমাপ্রসাদ
    - রূপায়ণ
  - দেবপ্রসাদ
    - কৌস্তভ
  - হরপ্রসাদ
  - কালীপ্রসাদ
    - অনুভব
  - দুর্গাপ্রসাদ
  - বাণীপ্রসাদ
    - নীলাভ
  - সতীপ্রসাদ

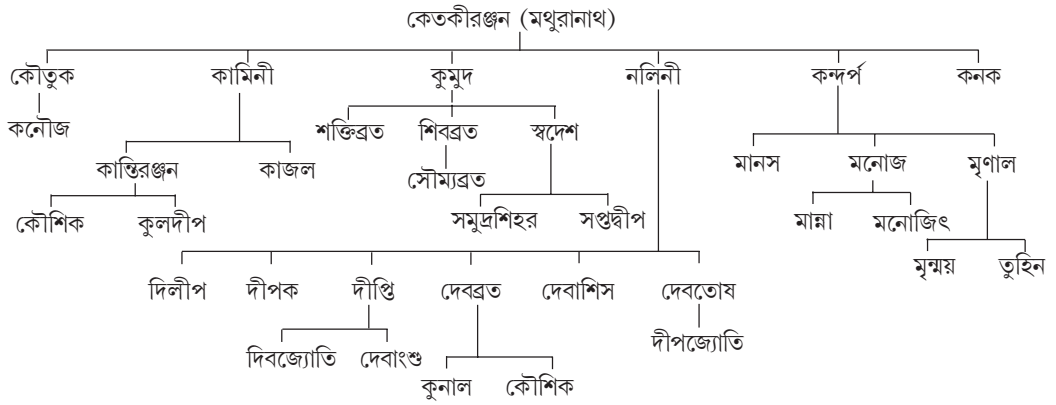
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
সৌম্যব্রত
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক

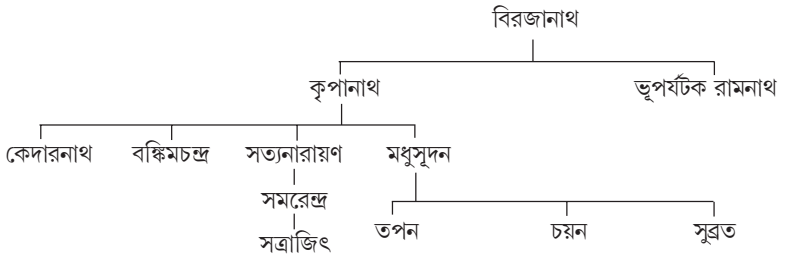
বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত

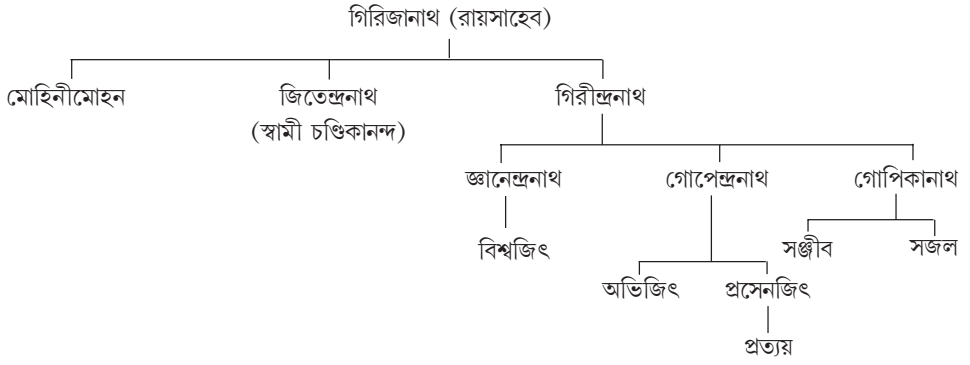
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল

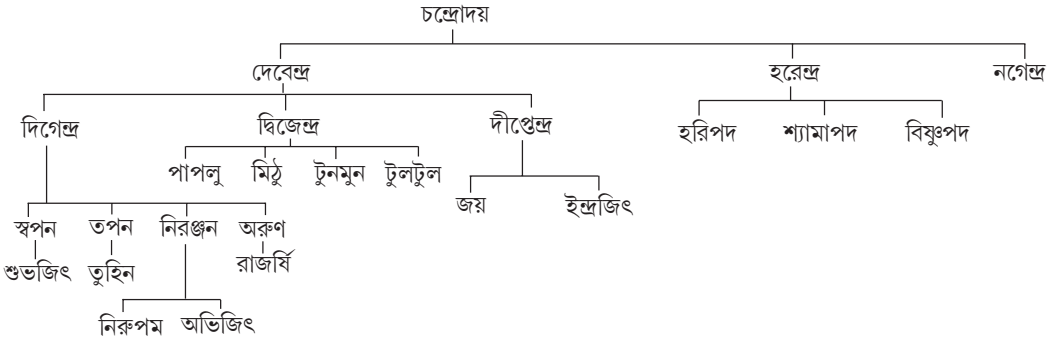
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

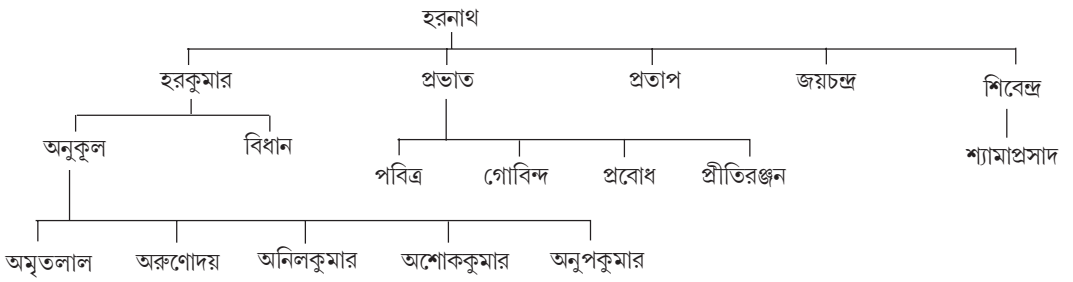

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে — এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, বর্তমান কুলপঞ্জিটি ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। তবে দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়! ❑

মতামত

(এক)

কয়েকজন গুণী মানুষকে দিয়েছি

প্রতি
শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য,
মুম্বাই।
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার প্রেরিত স্মারকগ্রন্থ পেয়েছি। প্রাপ্তিসংবাদ জানাতে দেরি হল, কারণ, আমার সম্প্রতি বাইপাস অপারেশন হয়েছে। হৃদ্‌রোগে মারাত্মক অবস্থা হয়েছিল।

প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ' একটি নতুন ক্ষেত্রকে কর্ষণ করেছে। এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ, তাই মন্তব্য করতে চাই না।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের অ্যাকাডেমিক রচনা 'আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প' বেশ ভালো লেখা। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দন বিদ্যার আলোকে আলোচনা হলে বেশ হত। উদাহরণে কোনো বাংলাদেশী কবির কবিতা উদ্ধৃত হয়নি। মনে হয়েছে, ডান হাত সক্ষম, বাম হাত পঙ্গু। [স্মারকবক্তৃতায় বিশ্ববন্ধুবাবুকে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়নি। — সম্পাদক]

সাহিত্য পুরস্কার প্রাপকদের পরিচিতি থেকে অনেক বিষয় জানা গেল। এ পুরস্কার কি পশ্চিমবঙ্গ ও অসমেই সীমাবদ্ধ থাকবে? [গতবছর বাংলা ভাষার পুরস্কৃত কবি স্বপন সেনগুপ্ত অসমের নন, ত্রিপুরার অধিবাসী। — সম্পাদক]

আমি স্মারকগ্রন্থের কপি কয়েকজন গুণী মানুষকে দিয়েছি। তাঁরা হয়তো পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানাবেন।

নৃপেন্দ্রলাল দাশ
শ্রীমঙ্গল, মৌলবিবাজার (বাংলাদেশ)
২২.০৮.১৪

(দুই)

বোড়ো কবিতা নিয়ে অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘদিনের

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য,
সাধারণ সচিব, রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই।
স্নেহের শ্যামাশিস,

তোমার ১২.৭.১৪ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। এই দেরি অনিচ্ছাকৃত। টেবিলে অন্যান্য বই ও পত্র-পত্রিকার নীচে স্মারকগ্রন্থটি চাপা পড়ে থাকায় তা পড়ার সুযোগ হয়নি। আজ তা খুঁজে পেয়ে পড়ে নিয়ে লিখতে বসলাম।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতাটির। কয়েকদিন আগে সাহিত্য অকাদেমিতে গিয়েছিলাম, সেখানে Bodo Short Stories-এর একটা সংকলন দেখলাম। ছোটগল্পের মতো বোড়ো কবিতার কোনো সংকলন বেরিয়েছে কি না জিগ্যেস করায় জানতে পারলাম যে সেটা প্রস্তুতির পথে। বোড়ো কবিতা নিয়ে আমার অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘদিনের। বাসব রায় কৃত স্বচ্ছ সাবলীল অনুবাদ থেকে তা অনেকাংশে মিটল। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প' নিয়ে রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতাটি একটি অসাধারণ মনোগ্রাহী রচনা। অত্যন্ত সহজ, সুন্দর, সরল ভাষায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্পের পৃথক ব্যঞ্জনা উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিয়েছেন। যথার্থই বলেছেন, "উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প ছাড়া যে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় না এ-সত্যটি আধুনিক কবিদের অবশ্যই জানা ছিল।" জানা ছিল, তাই আধুনিক কবিতার সুপ্রযুক্ত উদাহরণ দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা পাউন্ডের প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি — "It is better to present one image in a lifetime than to produce voluminous work." এর সঙ্গে আধুনিক কবিতার ভাষাও যে এতদিনের পরিচিত ভাষা থেকে কীভাবে আলাদা হয়ে গেছে তাও বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন।

দশকের পর দশক কবিতার চেহারা পালটে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পালটেছে কবিতার প্রকাশভঙ্গি। ষাটের দশক পর্যন্ত উদাহরণ সহযোগে

কবিতার প্যাটার্ন ও চিত্রকল্প কীভাবে পালটে গেছে তাও বিশ্ববন্ধু বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় দেখিয়েছেন। তবে ষাটের দশকের রমানাথ ভট্টাচার্য তাঁর সনেট রচনায় যে-নতুন 'ডিকশন' সৃষ্টি করেছেন তার উল্লেখ করলে ভালো লাগত। [ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশ্ববন্ধুকে যে-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল তার সঙ্গে পত্রলেখকের এই বিষয়টি সম্পর্কিত নয়। — সম্পাদক]

বিশ্ববন্ধুবাবু একজন প্রথম শ্রেণির প্রাবন্ধিক শুধু নন, কবিতার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণও চমৎকার করতে পারেন। এই বৌদ্ধিক রচনাটি আপামর বাঙালি কবিতা-পাঠকের বোধকে সমৃদ্ধ করবে। এর জন্য বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ো।

পরিশেষে, নৃপেন্দ্রলাল দাশ-এর 'বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ' একটি মূল্যবান নিবন্ধ। আমরা বিবেকানন্দের শুধু নির্ভেজাল প্রশংসা শুনে আসছি, কিন্তু পদ্মনাথের মতো একজন বিরুদ্ধবাদীর সম্মুখীন তাঁকেও হতে হয়েছিল দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। পদ্মনাথ যে কতটা দুঃসাহসিক ছিলেন তা বিভিন্ন ব্যাপারে বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে প্রমাণিত। তবে স্বামীজির প্রতি পদ্মনাথের প্রীতিময় অনুরাগও লেখক দেখিয়েছেন। রচনাটি খুব ইন্টারেস্টিং এবং এইরকম একটি দুর্মূল্য প্রবন্ধ বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। রচনার উৎকর্ষে ও মুদ্রণ পারিপাট্যে স্মারকগ্রন্থটি অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য।

অনন্ত দাশ

বি-১/কে, সারদা পার্ক

জোত শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০১৪১

১৬.৯.২০১৪

(তিন)

পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনার পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছিত

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য

সাধারণ সচিব

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই।

মাননীয়েষু,

আপনাদের পাঠানো পদ্মনাথ-রামনাথ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৩-এর স্মারকগ্রন্থটি পেয়েছি।

সুসম্পাদিত স্মারকগ্রন্থের সকল রচনাই প্রশংসার্হ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, আপনারা প্রায় একশো বছর আগে লেখা পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করে একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য ও জাতীয় দায় পালন করেছেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং কবি কমলেশ দাশগুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার প্রস্তাব : সম্ভব হলে রামনাথের এ-রকম কোনো রচনা বা রচনাংশ পরবর্তী সময়ে যদি প্রকাশ করেন কিংবা প্রতিবছরের অনুষ্ঠানে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু রচনাংশ পাঠ ও প্রকাশ করেন, তাহলে বর্তমান প্রজন্ম এঁদের সম্পর্কে জানতে আরো বেশি আগ্রহী ও উৎসুক হবে।

প্রস্তাবটি বিবেচনা করলে বাধিত হব। [পত্রলেখকের প্রস্তাব যে ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে তার প্রমাণ— বর্তমান স্মারকগ্রন্থে পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনার পুনর্মুদ্রণ।— সম্পাদক]

শুভেন্দু বারিক

৬/১০/১৪

১৪২/১০, বিশালাক্ষীতলা রোড

কলকাতা-৭০০০৬০।

(চার)

সৃজনশীল চিন্তার আদানপ্রদানের অন্যতম মাধ্যম

সম্মাননীয়

সম্পাদক, স্মারকগ্রন্থ।

নমস্কার নেবেন।

'রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন' যে দুটি পুরস্কার প্রতি বছর অসমের সুন্দর শহর গুয়াহাটিতে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুজন কৃতি মানুষকে অর্পণ করে সে-খবর জানি আগে থেকেই, তবে যে-স্মারকগ্রন্থটি তাঁরা এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেন তা জানি গত বছর থেকে।

এই বছরও স্মারকগ্রন্থটি আমার হাতে এসেছে। এই সংগঠনের বড় কাজটি অর্থাৎ যা আমার খুব মনে হয়েছে তা হল, দুজন কৃতবিদ্য নিরলস অনুসন্ধানী ব্যক্তিত্বকে স্মরণ; তাঁদের যেটুকু কাজ তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, অসমিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে চিরায়ত ঐতিহ্য এবং সঠিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি অস্তিত্ববোধসম্পন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপকল্প ও আদর্শিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করা। যদিও এই কাজটি দুরূহ তবু 'রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন'-এর সংগঠক, কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার উদাহরণ আমাদের এক দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী কার্যক্রমের আভাস দেয়; পাই সাহিত্যের নির্মল আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। কারণ একটি সুস্থ সংগঠন মানব-সমাজে সুন্দর সম্পর্ক নির্মাণ ও সৃজনশীল চিন্তার আদানপ্রদানের অন্যতম মাধ্যম। এই প্রেক্ষাপটে সুদূর মুম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত 'রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন' একটি মহৎ কর্মযজ্ঞের সূত্রধর। সংস্থাটিকে জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

স্মারকগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ' এবং 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (বিশ্বদা, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একদিন রাতের কার্যালয়ের আড্ডায় অন্যতম প্রয়াত কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত) কৃত প্রবন্ধ দুটি তথ্যসমৃদ্ধ ও মূল্যবান। স্মারকগ্রন্থটির সম্মাননীয় সম্পাদক কবি সুকুমার বাগচিকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

এইসূত্রে বলি, এক স্মরণযোগ্য অনুষ্ঠানে (বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব, ২০০৭-০৮) ফাউন্ডেশনের সভাপতি কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয়ের দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল, তাঁর কাছ থেকে কিছু স্বলিখিত গ্রন্থও পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর স্বল্প সময়ের সঙ্গ ও আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপ আজও মনে আছে। চট্টগ্রাম লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রম তাঁকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল।

বাংলাদেশে এই দুর্লভ ছোট পত্রিকার সংস্থাটি শুধু সংগ্রহের কাজ নয়, সারা বাংলাদেশের লিট্‌ল ম্যাগ কর্মীদের জন্য বাংলা সাহিত্য চর্চা, লিট্‌ল ম্যাগ প্রকাশনা, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ছাত্র ও গবেষকদের সহায়তা, প্রবীণ ও নবীন লিট্‌ল ম্যাগ কর্মী সম্পাদকদের সম্মাননায় ('সীমান্ত' সম্পাদক ভাষা সৈনিক, একুশের প্রথম কবিতাকার মাহবুবুল আলম চৌধুরী, 'বিভাব' ও 'কৃত্তিবাস' সম্পাদক কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, 'মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা' সম্পাদক মিজানুর রহমান, 'গণসাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক আবুল হাসনাত, বর্তমানে 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক, 'থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদক নাট্যকার রামেন্দু মজুমদার প্রমুখ ইতিমধ্যেই স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন) এই সংস্থা প্রায় প্রতি বছর সেমিনার ও লিট্‌ল ম্যাগ বিষয়ক অনুষ্ঠান করে থাকে, দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থও প্রকাশ করেছে এই সংস্থাটি। বাংলাদেশে এই প্রগতিবাদী একমাত্র লিট্‌ল ম্যাগ লাইব্রেরিটি বিভিন্ন কারণবশত হীনম্মন্য ও সাহিত্যের ছদ্মবেশ পরিহিত ব্যক্তিদের দ্বারা বৈষম্য ও বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের শিকারে পরিণত। এইসব ব্যক্তিই সংস্থাটিকে বিবিধভাবে ধ্বংস করে দেওয়ারও পাঁয়তারা করছে! বাংলাদেশে এটিই প্রথম ও একমাত্র লিট্‌ল ম্যাগাজিন আর্কাইভ। এইসব পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও এই প্রতিষ্ঠানটি তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সহযোগিতায় (প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামান, প্রয়াত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণিতবিজ্ঞানী প্রফেসর এমেরিটাস জামাল নজরুল ইসলাম, ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমিয় বাগচি, প্রফেসর হায়াত মামুদ, প্রফেসর আবদুল্লা আবু সইদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সাহিত্যিক মফিদুল হক, প্রফেসর আবুল মনসুর প্রমুখ) এই সংস্থার আর্কাইভটি সমৃদ্ধ হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও কিছু বিদ্বজ্জনের সহায়তায় আজ এই প্রতিষ্ঠানটি একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আর্থিকভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত!

দুষ্প্রাপ্য ছোট পত্রিকার বিশাল ভান্ডারটি সঠিকভাবে সংক্ষরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা এই আয়বিহীন প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কমলেশ দাশগুপ্ত

পরিচালক

চট্টগ্রাম লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টার

৩৯, মহিম দাস রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ (বাংলাদেশ)

১৯ অক্টোবর ২০১৪